

জেনারেল পোষ্ট আফিস

দেওয়ানি আদালত নামে দুর্গের দক্ষিণে আর একটি আদালত ছিল। ঐ বাটী এক্ষণে মিলিটারি হাসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। (২৯)

বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউস্ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরের ১২ই ফেব্রুয়ারি মহা ধূমধামের সহিত বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর বসান হয়। যে স্থানে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা পুরাতন দুর্গের উত্তর সীমা। পূর্ব্বে দুর্গের দক্ষিণ সীমায় কয়লা ঘাটে কাষ্টম্ হাউস্ ছিল। (০)

সৌধসম্পদে কলিকাতা অতুলনীয় নগরী। পূর্ব্ব বর্ণিত স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাগার, বিচারালয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন সেণ্ট্রাল্ টেলিগ্রাফ্ অফিস, জেনারেল্ পোষ্ট অফিস, ছোট আদালত, রেলওয়ে অফিস প্রভৃতির অনেক উৎকৃষ্ট সৌধাদি কলিকাতায় বিদ্যমান আছে। এ সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গির্জ্জা, মন্দির বা মস্‌জিদ্ প্রভৃতির কথাও এ প্রবন্ধে বলা হয় নাই।

(২৯) The Early History and Growth of Calcutta.

(৩০) The Good Old Days of Honourable John Company.

গঙ্গার পশ্চিম দিক

বালি হইতে ত্রিবেণী

কলিকাতার পর হুগলী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে যে সব নগরী আছে, তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি বাঙ্গালার অন্যান্য বহু গ্রাম সকলের তুলনায় অধিক। তদ্ভিন্ন পাশাপাশি এতগুলি গণ্যমান্য গ্রাম ও নগরী অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। দেশ বৈদেশিক শাসনাধিকারে আসার পূর্ব্বের কোন কথাই প্রায় জানিতে পারা যায় না। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা পুঁথিতে মাত্র কতিপয়ের নাম পাওয়া যায়। সে সকল পুঁথির মধ্যে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" ও বিপ্রদাস কৃত "মনসা মঙ্গলে"র নাম করা যাইতে পারে। "পাণ্ডব দিগ্বিজয়" বা "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও (১) বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগরের কথা পাওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া আছে; কিন্তু উহা সব ভাগীরথী-তটবর্ত্তী স্থান নহে।

এই সকল স্থানের যে সব ঐতিহাসিক বা অন্যান্য পরিচয় আছে, তাহার সমস্ত কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নহে। মাত্র যে কিছু পুরাতন বিশেষ কথা, বা যাহার জন্য স্থানের প্রসিদ্ধি তাহার মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহাই অতি সংক্ষেপে বলা উদ্দেশ্য।

বালি বৈদেশিকগণের আগমনের বহু পূর্ব্বের সহর। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহার উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, অন্ততঃ সাড়ে তিন শত

(১) ইহা প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।



হুগলী নদী—দশম শতাব্দীর নক্সা
বিপ্রদাসকৃত মনসামঙ্গলে লিখিত স্থানগুলি দেখান আছে।

বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল। যে অষ্ট স্থান হইতে বাঙ্গালা পঞ্জিকা প্রকাশিত হইত, বালি তাহার অন্যতম। শ্রীরামপুর এই খ্যাতি ইহার পরে অর্জ্জন করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা ব্রাহ্মণ-প্রধান নগরী। কথিত আছে, সহস্রাধিক ঘর ব্রাহ্মণের এখানে বাস ছিল। বালির উত্তর প্রান্তস্থিত ছোট দুইটি মন্দির বিশপ হিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বালিতে খালের উপর যে সেতু আছে উহা প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কাপ্তেন গুড্উইন (Captain Goodwin) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালায় এরূপ সুদৃঢ় ও সুন্দর অন্য কোনও সেতু কোথাও ছিল না। কিঞ্চিৎ ন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দেশী চিনির কাজ প্রবল ছিল।

এখানকার উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। খামার-গাছি নিবাসী নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় হইতে এই বংশের উদ্ভব হয়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ঢাকা কলেক্টারিতে কার্য্য করিতেন। স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহারই পৌত্র ছিলেন। তিনি ১২১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম রেজিমেণ্টের একজন কেরাণী-রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে প্রচুর ধনসঞ্চয় এবং তাহার অনেক অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া কলেজ ও লাইব্রেরি তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। এই পুস্তকাগারের ন্যায় বড় ও মূল্যবান পুস্তকাগার বাঙ্গালায় খুব কমই আছে। এখানকার সকল প্রকার সমৃদ্ধির মূলে মুখোপাধ্যায়-বংশের বদান্যতা বিরাজিত। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। (২)

কোন্নগরও একটি পুরাতন স্থান। ইঁহাও পূর্ব্বে বেশ ধনজনপূর্ণ ছিল।

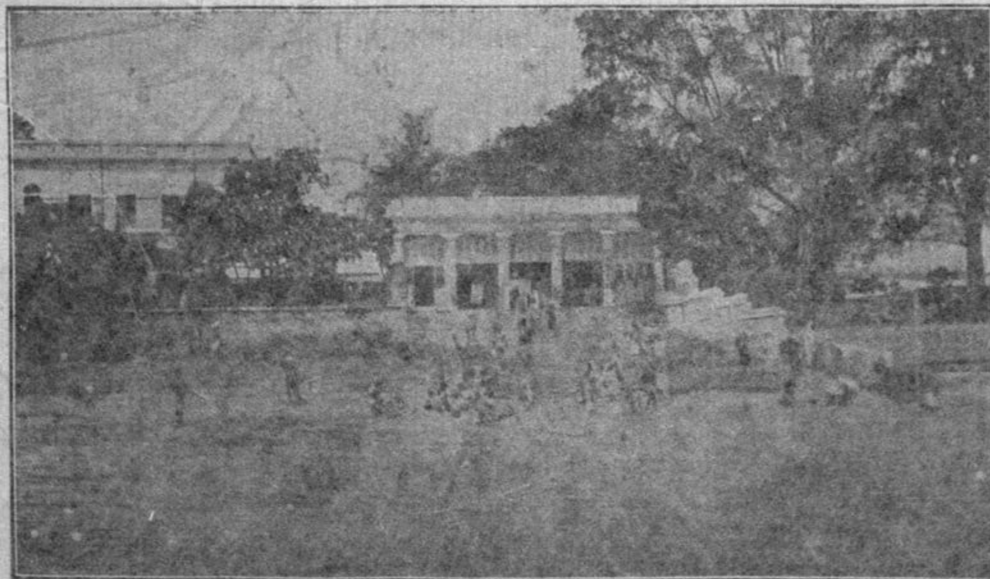
(২) District Gazetteers—Hughly.

তথন একটি ডক্ ছিল। ডক্‌টি দ্বাদশ মন্দির ও ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। উক্ত ঘাট ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরসুন্দর দত্ত। উল্লিখিত ডক্‌টি বাঙ্গালায় বৃটীশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

রিষড়ার সমৃদ্ধিও এথনকার তুলনায় পূর্ব্বে অধিক ছিল। এথানে সময় সময় দিনেমারদের জাহাজ লাগিত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এথানে সাহেবদের ছাপা কাপড়ের একটি বড় কারথানা ছিল। এই কারথানা দীর্ঘকাল ধরিয়া একে একে বহু ইয়োরোপীয়ের হস্তান্তরিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর সেন নামক এক ব্যক্তির হাতে আসে। এই ব্যক্তি মাসিক ৮৲।১০৲ টাকা বেতনে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে এই কার্য্যের দ্বারাই প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতি কলের বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এথানকার এই ব্যবসা ক্রমে লোপ পায়। পরে উহার পরিবর্ত্তে রেশমি রুমাল ছাপার কাজ এই স্থানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।

এথানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একট পল্লীনিবাস ও তৎসংলগ্ন সুন্দর উদ্যান ছিল। ইহাকে "রিষড়া হাউস্" বলিত। কথিত আছে, হেষ্টিংসের তথায় অবস্থানকালে তদীয় পত্নী স্বহস্তে এই উদ্যানে বহুসংখ্যক আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আজিও তথায় হেষ্টিংস ঘাট নামে একটি ঘাট দৃষ্ট হয়। কোন্নগর ও রিষড়ার নাম বিপ্রদাসের পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

মাহেশও একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও এই নামে এই নগর ছিল বলিয়া জানা যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরও এইরূপ পুরাতন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরীর পর এই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ প্রচারিত, বোধ হয় অন্যত্র এরূপ নহে। কিংবদন্তী এইরূপ যে পুরী হইতে জগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম

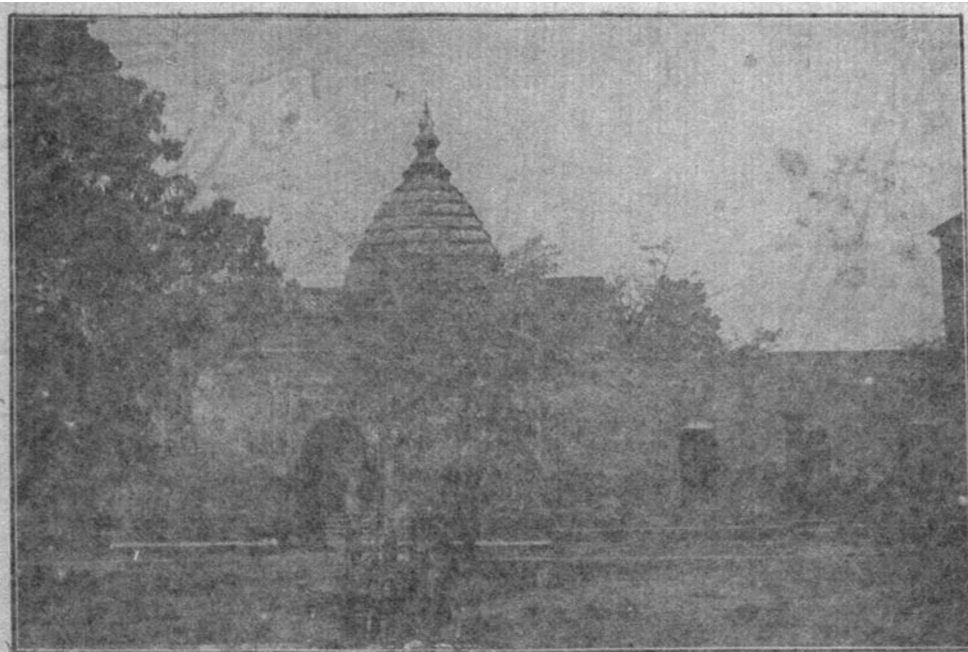


হেষ্টিংস ঘাট—রিষড়া

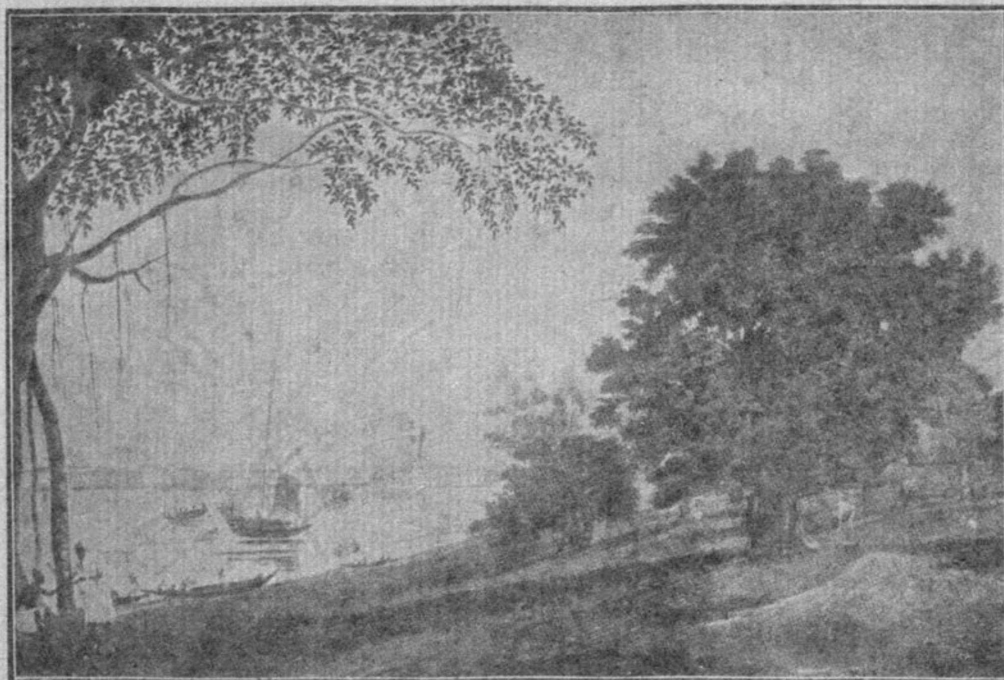
করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেবপ্রতিষ্ঠা হইয়া তাহা স্মরণার্থ প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহা ধূমধামের সহিত স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরীতীর্থে গমন করিলে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য জগন্নাথদেব কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং উহাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু দিন পরে এক দিন মুরশিদাবাদের নবাব ভাগীরথীবক্ষ দিয়া গমনকালে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ হওয়ায়, দেবসেবাইৎগণ তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ায়, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া সেবাইৎকে অধিকারী উপাধি ও একখণ্ড নিষ্কর জমি দান করেন। এই সময় হইতেই মাহেশের মন্দিরের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। মাহেশের যে রথ সুপ্রসিদ্ধ তাহার প্রথম-খানি এক মোদক দান করিয়াছিলেন। (৩)

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভদেবের জন্য প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেবাদিষ্ট হওয়ায় তাঁহার দ্বারা গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই দেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। এই প্রস্তর গঙ্গায় ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়াছিল। উহা প্রথম যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তথা হইতে পরে স্থানান্তরিত হইয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশের কোন মহাত্মার দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তমান মন্দিরে আনীত হয়। রাধাবল্লভজী ও উহার মন্দির সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ রাধা-বল্লভজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন এবং তিনি এই দেবসেবাদির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

(৩) District Gazetteers—Hughly.



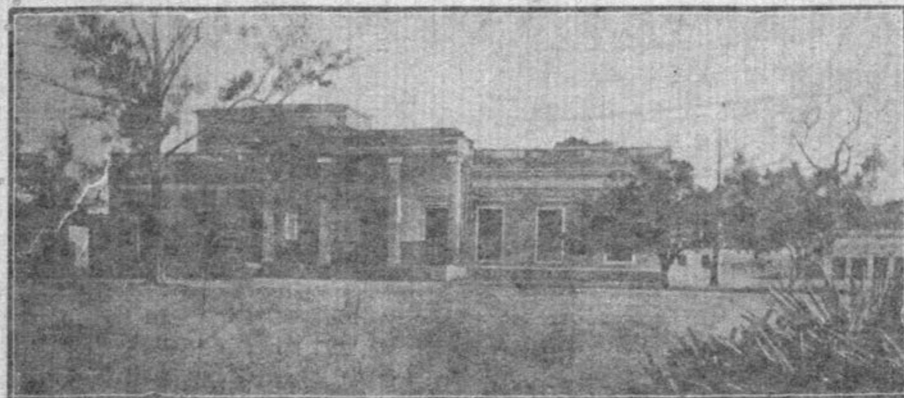
জগন্নাথদেবের মন্দির—মাহেশ



বারাকপুর পার্ক হইতে শ্রীরামপুর

খৃষ্টান মিশনরিদের সংশ্রবেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বাং ভাষার গঠনমূলে শ্রীরামপুরের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায় এখানকার প্রাচীন ইতিহাসও অজ্ঞাত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারদের এখানে আগমনের প্রসঙ্গেই উহার কথা প্রথম জানা যায়। কার্য্যের সুবিধার জন্য মুরশিদাবাদের ফরাসী এজেন্ট মঁসিয়ে ল'র (Mons. Law) চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাঁহারা এই স্থান প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরের ৮ই অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরে দিনেমার পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য চারিজন জমাদার নিযুক্ত করা হয়। নবাবের নিকট হইতে ফরমান পাইতে ও জমি সংগ্রহ করিতে মোট ১৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল। দিনেমাররা মোট ৬০ বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিনেমাররা এখানে প্রথমে একখানি চালাঘর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা মাটির প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া কুঠির কার্য্য আরম্ভ করেন। সে সময় তাঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ সোয়েৎম্যান্ (Mr. Soetman)। প্রায় অৰ্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা এখানে অব্যাহতভাবে ব্যবসাকার্য্য চালাইয়া সবিশেষ উন্নতিলাভ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের সহিত ডেন্‌মার্কের যুদ্ধ হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে প্রথম বাধা প্রাপ্ত হন। এই সময় ব্যারাকপুর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং ইহা ইংরাজদের হস্তগত হয়। পরে ইয়োরোপে শান্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। এই সময় কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়। ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক হওয়ায়, ডেনমার্কের রাজা উহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয়ের কল্পনা করেন; এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর শ্রীরামপুর ও ট্রান-কোয়েবার, ঠিক ৯০ বৎসর ৩ দিনের পর ১২,০০০ পাউণ্ডে হস্তান্তরিত হয়।



দিনেমার গভর্ণরের বাটী—শ্রীরামপুর ; এক্ষণে কাছারীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে

শ্রীরামপুরকে ডেনমার্কের রাজার নামানুসারে তৎকালে ফ্রেড্রিক্‌নগরও বলা হইত।

১৭৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম খৃষ্টান মিশনরিরা আগমন করেন। তৎপরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্শম্যান্, ওয়ার্ড ও তাঁহাদের দুইজন মিশনরি বন্ধু এখানে আগমন করেন। তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর বিবেচনায় প্রথম দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন। পরে ডেভিড্ ব্রাউনের (Rev. David Brown) চেষ্টায় এই ভ্রম সংশোধিত হয় এবং তাঁহারা এখানে বসবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় মত মালদহে ডাক্তার কেরির নিকট যাওয়ার চেষ্টায় তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত হন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের মধ্যেই বসবাস করিতে বাধ্য হন। কয়েক সপ্তাহ পরে কেরিই এখানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এই তিনজনে মিলিয়া শ্রীরামপুর মিশনের সৃষ্টি করেন। এই মিশন, উহাদের মধ্যে শেষ মিশনরি মার্শম্যানের মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

এই মহাত্মাত্রয়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিবার স্থান এখানে নাই। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় যেমন বাঙ্গালায় দেশীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তেমনই তাঁহাদের পরিশ্রমে বঙ্গভাষারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম বিষয় গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ এখান হইতে তাঁহারাই প্রকাশ করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রথম বাঙ্গালায় মিশনরি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। মিশনরি মিঃ ম্যাকের চেষ্টায় প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র বাঙ্গালা অক্ষরে নাম সহ প্রকাশিত হয়। (৪) বৈদেশিকভাবে প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের

(৪) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করিয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মার্শম্যান সম্পাদিত "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। (৫) Friend of India'ও এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইত। এতদ্ভিন্ন ভারতে প্রথম ষ্টীম্ এঞ্জিন্ শ্রীরামপুরের কাগজের কলেই আনীত হয়। প্রথম বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করে এই স্থানে। খৃষ্টানী মতে বাঙ্গালীর বিবাহ হয় প্রথম এইখানে। বর্ত্তমান শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের প্রতিষ্ঠার মূলও শ্রীরামপুরের ডাক্তার কেরি। শ্রীরামপুর কলেজ মিশনরিদের

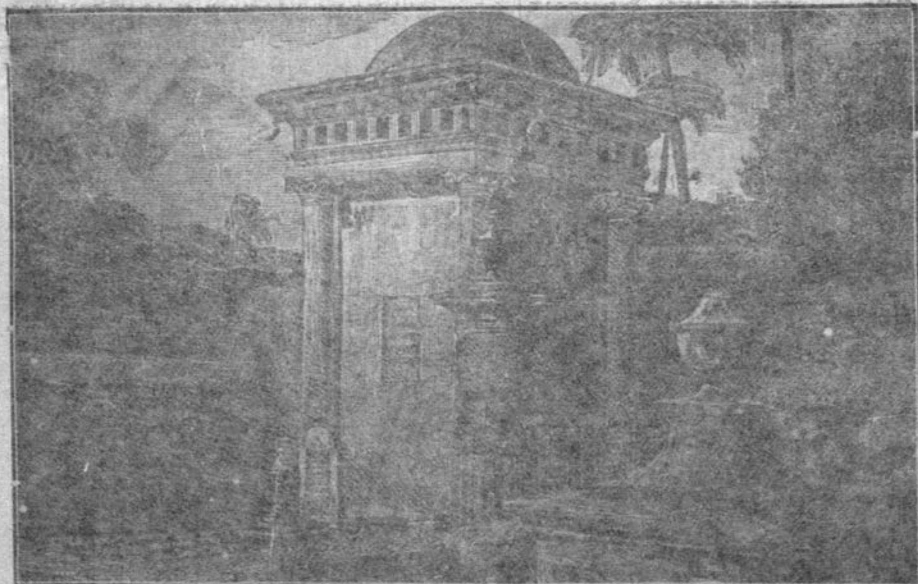


শ্রীরামপুর কলেজ

অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানকার গোরস্থানে এই তিন মহাত্মার সমাধি আজিও দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মিশনরিগণ ভিন্ন এখানে মিঃ ম্যাক্, ডেভিড্, ব্রাউন্, মার্টিন্, কুরি, বুকানন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মিশনরিগণও বাস করিতেন। তাঁহাদের বহু নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার মিশন চার্চ্চ, ডাক্তার কেরি ও তাঁহার সহযোগীদের দ্বারা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বাসভবনের

(৫) A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature—Long.



ডাক্তার কেরির সমাধি-স্তম্ভ—শ্রীরামপুর

সংলগ্ন জমির উপর নির্ম্মিত হয়। রোম্যান ক্যাথলিক্ গির্জ্জা সর্ব্বপ্রথম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান সুন্দর গির্জ্জাটি ১৩,৩৮৬৲ টাকা ব্যয়ে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। লুথেরান গির্জ্জা ১৮০৫ অব্দে ১৮,৫০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। কনভেণ্টটি অপেক্ষাকৃত নূতন, উহার নির্ম্মাণকাল ১৮৪০এর পর।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্রান্ত। আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে চন্দ্রের পুত্র ধরাধর গোস্বামী-বংশের আদিপুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামে ইঁহাদের আদি বাস ছিল। সেওড়াফুলি ও বংশবাটীর রাজাদের আদি বাসস্থানও এই স্থানে ছিল। গোস্বামীদের প্রকৃত উপাধি চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী শান্তিপুরের গোস্বামী বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামগোবিন্দ মাতুলের জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায়, তিনিই প্রথম গোস্বামী নামে খ্যাত হন। কথিত আছে, একদা নৌকা জলমগ্ন হইলে তিনি সন্তরণ করিয়া শ্রীরামপুরে উঠেন এবং তদবধি এই স্থানে বাস করেন। সুতরাং তাঁহাকেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি বাসের জন্য সেওড়াফুলির রাজাদের নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধামোহন, গোপাল ও রাধিকা এই তিন দেবদেবীর সেবাইৎ নিযুক্ত হন ও তৎসহিত উক্ত রাজার প্রদত্ত নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন। এখনও এই তিন দেবদেবী গোস্বামী-বংশের গৃহদেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

রামগোবিন্দের পুত্র হরিনারায়ণ দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথও পামার কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া, এবং ব্যবসা কার্য্যের দ্বারা বিস্তর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেন্মার্ক অধিপতি যখন শ্রীরামপুর

বিক্রয়ের অভিলাষ করেন, তিনি দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় উহা খরিদ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন নাই। (৬)

এখানকার দে-বংশও খুব প্রাচীন ও সম্পদশালী। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দমদমার নিকটবর্ত্তী গাঁতি নামক গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাস ছিল। তৎপরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রিষড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র দে ব্যবসায় উপলক্ষে শ্রীরামপুরে উঠিয়া আসেন। উক্ত দে মহাশয়ের একখানি মুদির দোকান ছিল। তাঁহার পুত্র সাথলীরাম তূলার ব্যবসা ও দিনেমার কোম্পানীর আনীত বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। তিনি কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের লবণের কাজে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিয়া, শেষে নিজ চেষ্টা ও কার্য্যদক্ষতায় লবণের ব্যবসা দ্বারা বিপুল সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং উপার্জ্জিত অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। ১২৩০ সালের আষাঢ় মাসে রামচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

এই দে-বংশ পূর্ব্বাপর অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। শ্রীরামপুরস্থ যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেই প্রায় ইঁহাদের অর্থসাহায্য আছে। শ্রীরামপুরে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার পূজার জন্য এক সুবৃহৎ মণ্ডপ ও কাশীতে শ্রীশ্রী৺শিব স্থাপন ইঁহাদের অন্যতম কীর্ত্তি। (৭)

(৬) District Gazetteers—Hughly.

(৭) বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা, ১৩৩২ সাল।

শ্রীরামপুরের পর চাতরা। ইহাও একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার গৌরাঙ্গ মন্দির অতি প্রাচীন। বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীর প্রসঙ্গে উহার প্রতিষ্ঠাতা যে রুদ্ররাম পণ্ডিতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার মাতুল কাশীশ্বর পণ্ডিত দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের একজন পার্শ্বচর ছিলেন। এই মন্দিরের একদিকে গৌরচন্দ্র অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজিত। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশ অধুনা চৌধুরী বংশ বলিয়া খ্যাত। পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এখনও উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এখানকার শীতলা মাতাও জাগ্রত দেবী। এই দেবী সমীপে ভক্ত-সমাগম খুব বেশী হইয়া থাকে এবং বৈশাখ মাসে ও শনি-মঙ্গলবারেই জনতা অধিক হয়। আনুমানিক দেড়শত বৎসর হইল ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার দেওয়ানঘাট নামক ঘাটটি প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন এরূপ সোপান রচনা নাকি হুগলী জেলার মধ্যে অন্য কোন ঘাটে নাই। রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবর্ত্তী ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চাতরা দীর্ঘকাল হইতে একটি ব্যবসা প্রধান স্থান এবং এ স্থানে বহু ব্রাহ্মণের বাস। (৯)

তৎপরে সেওড়াফুলি। এখানকার হাট ও কালীবাটী প্রসিদ্ধ। এই উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা সেওড়াফুলির রাজারা। বৈদ্যবাটীর পুরাতন ও সমৃদ্ধ হাটের প্রচুর আয় দৃষ্টে উক্ত বংশের প্রধান হরিশ্চন্দ্র প্রতিযোগিতা করিয়া এই বাজার স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বোক্ত নিস্তারিণী নামে এক অতি সুগঠিত কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির ও মূর্ত্তি গঠন কার্য্যে

(৯) চাতরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে চাতরার বিষয় অবগত হইয়াছি।

তাঁহার দশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কালী দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেওড়াফুলির রাজারা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইঁহাদের আদি বাস ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে পাটুলি নামক গ্রামে। মুসলমান রাজত্বকালে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় কোন ব্রাহ্মণ জমিদারকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করার জন্য, মুরশিদকুলিখাঁর সময়ে নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের



নিস্তারিণী-কালীমন্দির—সেওড়াফুলি

বংশগত "শুদ্রমনি" উপাধি প্রদান করেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা এই উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এমন বিখ্যাত মন্দির এ অঞ্চলে কমই আছে, যাহা কখন না কখন তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াছে। মাহেশের জগন্নাথদেবের সেবার্থ জগন্নাথপুর নামক পল্লী তিনি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।



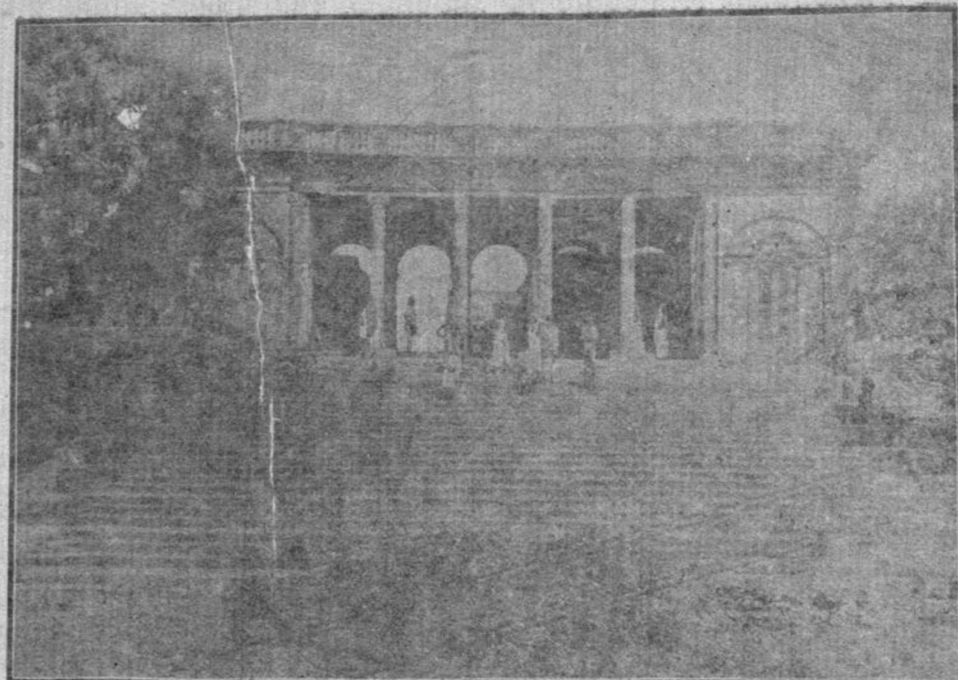
শ্রীশ্রীনিস্তারিণী কালী—সেওড়াফুলি

সেওড়াফুলির উত্তরে বৈদ্যবাটী। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু বৈদ্যের বাস থাকায় বৈদ্যবাটী নামের উৎপত্তি। বৈদ্যবাটীর যে প্রসিদ্ধ হাট আজিও বর্ত্তমান আছে, পূর্ব্বোক্ত সেওড়াফুলির বাজার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে পাট ও তরিতরকারীর এতাদৃশ হাট আর কোথাও ছিল না। এখনও কলা ও কুমড়ার এতাদৃশ হাট এ অঞ্চলে আর আছে কি না সন্দেহ। এখানকার শ্রীশ্রীভদ্রকালী অতি প্রাচীন দেবতা। সুপ্রসিদ্ধ নিমাই তীর্থের ঘাটটিও খুব প্রাচীন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে ঘাট সান্নিধ্যে নিম্বতরু রোপিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনচরিতে এবং অন্য বাঙ্গালা কবিতায় এরূপও লেখা আছে—এই নিমগাছ-ঘটিত ব্যাপার হইতে তাঁহার অন্য নাম নিমাই হইয়াছে। (১০)

এখানকার পুরাতন ঘাটটি পরে সংস্কৃত করা হয় এবং উহার উপর চাঁদনী নির্ম্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি ও বারুণীর সময় এখানে দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। উক্ত চাঁদনী প্রভৃতি চন্দননগরের স্বনামধন্য কাশীনাথ কুণ্ডুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্যে পথিকদের জন্য ডাক-বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রথম এই বৈদ্যবাটীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১১) বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র সহিত এই স্থানের সম্পর্ক আছে। (১২)

বৈদ্যবাটীর পর চাঁপদানী। এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রসিদ্ধি তেমন না থাকিলেও

(১০) District Gazetteers—Hughly.
(১১) Rural Life in Bengal.
(১২) District Gazetteers—Hughly.



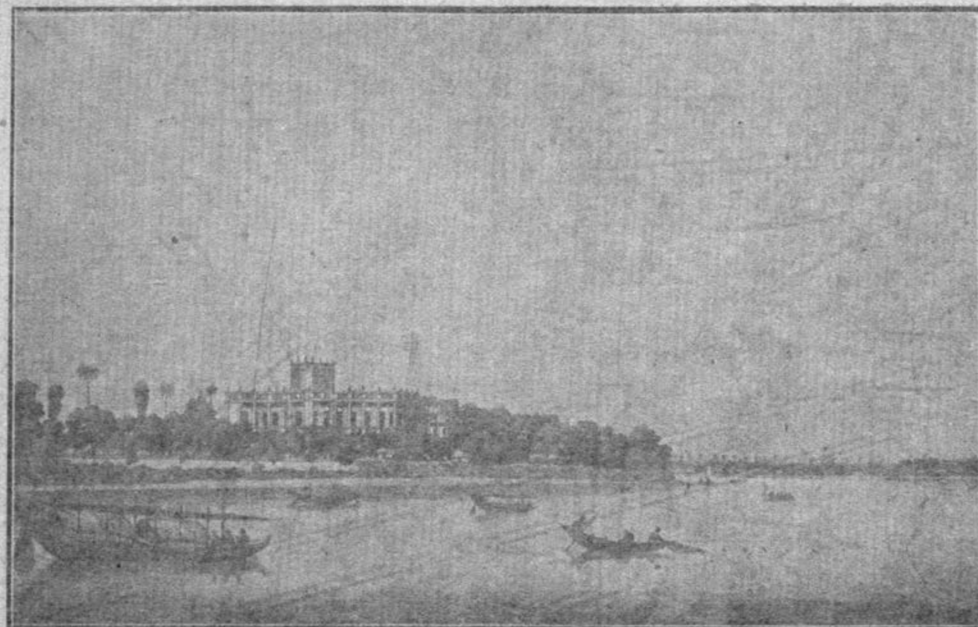
নিমাইতীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী

ইহা একটি প্রাচীন স্থান এবং বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার একটু সম্পর্ক আছে। মনসা মঙ্গলেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবনাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে প্রধান সেনাপতি কর্ণেল কুট্ (Sir Eyre Coot) ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাইদার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ জন্য, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে প্রেরিত সৈন্যের অবশিষ্ট সৈন্য পরিদর্শনার্থ হেষ্টিংস্ এই স্থানে আসিয়াছিলেন। (১৩) পূর্ব্বকালে এই স্থান ডাকাতি ও খুনের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল।

এই স্থানের পর গৌরহাটী। ইহার কতক অংশ বৃটীশ এবং কতক অংশ ফরাসী দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে গিরটি, গিরেটা, আবার কেহবা গরুটি বলিয়াছেন। ফরাসগঞ্জ নামেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১৪) বোল্টের ম্যাপ, জোসেফ্ সার্ভে ম্যাপ প্রভৃতি পুরাতন মানচিত্রে এই স্থান ফ্রেঞ্চ্ গার্ডেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সচরাচর লোকে ইহাকে গরুটি বলিয়া থাকে।

এই স্থানটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহা এক সময় চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের একটি রম্য উদ্যানভবন বা পল্লীবাস ছিল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে গভর্ণরের নিমন্ত্রণে ক্লাইব, ভিয়ারলেষ্ট, হেষ্টিংস, স্যর উইলিয়ম্ জোন্স, ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রমুখ চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইয়োরোপীয় সৌখীন নরনারী-গণের সর্ব্বদা সম্মিলন হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ

(১৩) District Gazetteers—Hughly.
(১৪) District Gazetteers—Hughly.



গরুটি-প্রাসাদ

থাকিত। (১৫) এই ভবন যেমন আনন্দ আড়ম্বরে সদা মুখরিত থাকিত, সেইরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত পরামর্শাদির জন্য মিলনেরও ইহা স্থান ছিল।

এই প্রাসাদের মধ্যে একটি এতবড় হল ছিল, যাহার মধ্যে একসঙ্গে একশত নরনারী স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ৩৬ ফিট ছিল। এই সুসজ্জিত বিচিত্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ ফ্রান্সের ভার্সেই-এর কোন কোন সম্ভ্রান্ত পল্লী-নিবাসের কথা মনে হইত। এমন কি, এই পল্লীকে কেহ কেহ পূর্ব্বের ভার্সেই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি (১৬) (Grandpre) ও কুরি (১৭) (Right Rev. Daniel Currie) এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। যে দেশে তাজমহল আছে, যে দেশের দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরে মুসলমান বাদশাহদের অনুপম প্রাসাদ সকল অবস্থিত, যাহার স্থাপত্যের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সকলেরও উপর বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সেখানে অবশ্য এ কথার কোন বিশেষ অর্থ আছে মনে হয় না। মনে হয়, লেখকের বলিবার উদ্দেশ্য, তৎকালীন ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত এ দেশের ইয়োরোপীয় ধরণের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া ঐতিহাসিক মার্শম্যান্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজেদ সমূহ দর্শনে দর্শকের মনে উহার পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এরূপ দুঃখের

(১৫) Selections from unpublished Records of Government for the years 1748 to 1767.

(১৬) A Voyage in the Indian Ocean and Bengal undertaken in the years 1789 and 1790.

(১৭) Heber's Journey through the Upper Provinces of India.



গরুটি প্রাসাদের শেষ চিহ্ন

নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্ণরের ভগ্ন-প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটীর বাগান।

বিশপ কুব্বি ভারত-ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্র্যময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভ সকল, বিবিধ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পেডিমেণ্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের শ্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় মোরেটন করবেট (Moreton Corbet) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র (১৮) নিদর্শন। ফরাসী গভর্ণর মঁসিয়ে শেভালিয়ে (Mons Chevelier) ইহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গৌরহাটীর পূর্ব্ব কথা, এমন কি কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জানা যায় না। মোটামুটি পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদের সহিতই ইহার ইতিহাস বিজড়িত। তদ্ভিন্ন ক্লাইবের সময় বাঙ্গালার সৈন্যদলের অধিকাংশ সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়। ষ্ট্রাভোরিনস্ (Stravorinus) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক লোক থাকিতে পারে ইংরাজদের এমন একটি মিলিটারি দুর্গ দেখিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৭৫৭ অব্দের মে জুন মাসে মিরজাফরের সহিত গোপন সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইব এইস্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন তিনি এই স্থান

(১৮) Heber's Journey through the Upper Provinces of India.



চাঁপদানীর মাঠ—কথিত আছে এই স্থানে ছাউনি ছিল।



বর্ত্তমান গরুটি

হইতেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশী প্রাঙ্গনে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। (১৯)

প্রাচীন কালের গৌরবময় যুগে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কবি আণ্টুনি সাহেব এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতেন।

এই পল্লীর পরই ভদ্রেশ্বর। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরের বাজারের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। এই দেবতার নাম হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। বুদেসি নামেও এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এত বড় গঞ্জ আর কোথাও ছিল না। কলিকাতা ও ভদ্রেশ্বরের চতুস্পার্শ্বস্থ দশ ক্রোশের সকল স্থানের ধান চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত। পাটের ব্যবসাও এখানে যথেষ্ট ছিল। ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ অজ্ঞাত। সাধারণের বিশ্বাস— ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথ দেবের ন্যায় স্বয়ম্ভূ। এই স্থানে এক সময় সংস্কৃত শিক্ষার চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল এবং শিক্ষার জন্য ১০টি টোল ছিল। (২০)

ভদ্রেশ্বর অতিক্রম করিয়া তেলিনীপাড়া নামক একটি ছোট গ্রাম আছে। এখানকার পুরাতন কথা বা প্রসিদ্ধির বিষয় কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের

(১৯) District Gazetteers—Hughly. The Musnud of Murshidabad ও অন্য কোন কোন গ্রন্থে ১০ই জুন লেখা আছে।

(২০) Adam's Report on Vernacular Education in Bengal.



শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির

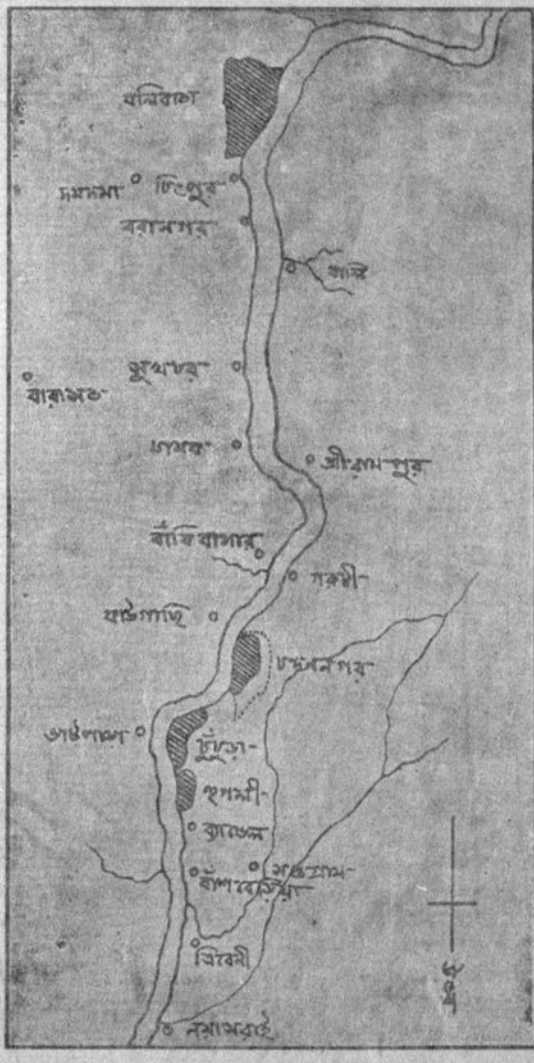
প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা মন্দির প্রসিদ্ধ। এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়।

ইহার পর চন্দননগর। এ স্থানের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে,—কিন্তু ফরাসীদের সহিতই ইহার পরিচয়। ইংরাজি ১৪৯৫ অব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসা-মঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিতে বা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাণ্ডব-দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে, ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্টে ইহার প্রাচীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও, কতিপয় পল্লী একত্র করিয়া চন্দননগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল সম্ভবতঃ ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর।

গঙ্গা-বক্ষ হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি-ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় সহরের আকৃতি থাকায় চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর এবং তাগ হইতে চন্দননগর, অথবা চন্দন-কাষ্ঠের ব্যবসা বা প্রচুরতা হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়। (২১) শেষোক্ত কারণ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চন্দন-কাষ্ঠের কাজ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। (২২) চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২:শে নভেম্বরে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মার্টিন্, দেঁলান্দ (Andre Boureau Deslande) এবং পেল্এ (Pelle) স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রে। (২৩)

ফরাসী কোম্পানির প্রথম অধিনায়ক মঁসিয়ে দেলান্দ মোগল বাদসার

(২১) প্রজাবন্ধু, ২৭ কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল ও Hooghly Past and Present.
(২২) La Compagnie des Indes Orientales.
(২৩) La Compagnie des Indes Orientales.



রেনেলের প্রস্তুত হুগলী নদীর নক্সা

নিকট হইতে ৪০,০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের অনুমতি প্রাপ্তির অনেক কাল পূর্ব্বে ডুপ্লেসি (Du Plessis) নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে সহরের উত্তর প্রান্তে বোড় কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ২০ আরপাঁ (arpents) (২৪) পরিমিত জমি ৪০১৲ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২৫)

দেলান্দ এখানে কুঠি স্থাপনের পর এই নূতন উপনিবেশে কোম্পানির কার্য্য-পরিসর দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় কোম্পানি বলিতে ডিরেক্টর ১ জন, ৫ জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সিল্, ব্যবসাদার ও দোকানদার ১৫ জন, নতের ২ জন, পাদরি ২ জন, ডাক্তার ২ জন ও সূত্রধর ১ জন মাত্র ছিল ; এবং পদাতিক ১০৩ জন, তন্মধ্যে ২০ জন ভারতীয়—ও ৩টি কামান ছিল। (২৬) চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ আরলাঁ দুর্গ (Fort de Orleans) ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা সহরের মধ্যস্থলেই ছিল এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ ও কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মজবুত ও জমকাল ছিল। (২৭) কিন্তু উহার প্রসিদ্ধি ইহাতে নহে। আজি যে পরাক্রান্ত বৃটীশ জাতি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় জাতি, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ এই দুর্গপাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে যে নীতি ধরিয়া এই চন্দননগরে

(২৪) ফ্রান্সের পূর্ব্বেকার জমির এক প্রকার মাপ। এক আরপাঁ প্রায় তিন বিঘার সমান।

(২৫) La Mission du Bengale Occidental, Vol. I.

(২৬) La Mission du Bengale Occidental Vol. I.

(২৭) Hughly Past and Present ও Calcutta Past and Present.

বসিয়া এক দিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই আজ তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান জাতি। ভাগ্যচক্রের গতি ভিন্নরূপ হইলে আজ ভারতেতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

ফরাসীদের প্রথম অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের মূল কোম্পানির অমনোযোগিতা ও এখানকার অর্থাভাবে কোম্পানির অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। তৎপরে কিঞ্চিদধিক প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইলে ইংরাজি ১৭৩১ অব্দে ডুপ্লের ডাইরেক্টররূপে এখানে আগমনের সহিত শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সম্ভ্রমে দশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে এ স্থান নবীন শ্রী ধারণ করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অপর সকল পাশ্চাত্য জাতি সকলের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। এই সময় এখানকার সহিত সুরাট, জেড্ডা, বসোরা, তিব্বত, পারস্য এমন কি সুদূর চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় তখন সমস্ত বাঙ্গালার উপর এখানকার বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন এই উন্নতিশীল উপনিবেশটিকে বেশ সুরক্ষিত দেখিয়া এবং এখানে ব্যবসাদি কার্য্যের সুবিধা বিবেচনায় অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতার শোভা-সম্পদ-বাণিজ্য সর্ব্ব বিষয়ই এ স্থানের তুলনায় হীন ছিল। এই সময় এখানে সুন্দর রাজবর্ত্ম বেষ্টিত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল, ও এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। (২৮)

ডুপ্লের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত এ স্থানের উন্নতি

(২৮) History of the French in India.



পুরাতন চন্দননগর

হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর ইহা বৃটীশদের হস্তগত হয় এবং সেই সঙ্গে ফরাসী জাতির ভারতে প্রতিষ্ঠা-লাভের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ক্লাইবের আদেশে দুর্গের তলদেশ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয় এবং সহরের প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া সহরের পূর্ব্ব শ্রী লুপ্ত করা হয়। ইংরাজি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ইহা ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যর্পিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকবার ইংরাজ হস্তে, পুনঃ ফরাসীদিগের হস্তে যাওয়ার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষবার ফরাসীদের হস্তে আসিয়াছে এবং সেই পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীদের হাতেই আছে। ভাগীরথীতীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরাজদের কথা ছাড়িয়া দিলে এক্ষণে কেবলমাত্র ফরাসীরা ভিন্ন তাঁহাদের আর সকলেই গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে এখানে অহিফেন, বস্ত্র, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশি ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন ইয়োরোপে পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রধান। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রম ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম যশোহরের কোন স্থান হইতে তাঁহার বিধবা মাতার সহিত এখানে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ফরাসী কোম্পানির অধীনে সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া শেষে প্রধান সহায় রূপে কোম্পানির বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং কোম্পানির মাল খরিদ-বিক্রয় দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ সম্মানেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং দুইটি স্বর্ণ পদক পাইয়া-

ছিলেন। কথিত আছে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবরোধের পর ইংরাজ সেনা কেবল তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়াই প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। (২৯) এই সময় ক্লাইবের গোলায় তাঁহার বিশাল বাসভবন চূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে চৌধুরী-বংশ একেবারে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে; আছে কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চৌধুরী ঘাট" "নন্দদুলালের মন্দির" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্জ্জ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় চাকুরীর উমেদারীর জন্য আসিতেন।

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই এখানকার মধ্যে ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসু মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে আসিয়া প্রথমে বেলকুলি, পরে বেলকুলির নবাবের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত জমিতে খলিসানী গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই বংশ প্রাচীনতায় ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য এখানে বিশেষ খ্যাত। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বসু-বংশ অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া যাইলেও যথারীতি দোল দুর্গোৎসব ও পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী, নন্দনন্দন, বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। হালদার মহাশয়দের আদি পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রী৺বোড়াইচণ্ডী ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত। এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু বংশের মধ্যে

(২৯) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন সন ১৩২৮ সাল।

বারাশতের শ্রীমানী ও দে, বাগবাজারের সরকার, নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষ, পালপাড়ার পাল, বেড়োর পালিত, পাল, বসু ও কুণ্ডু প্রভৃতি এবং দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দেবী সরকার, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোল্লা হাজি, কাশীনাথ কুণ্ডু, রামকানাই সরকার, নবকৃষ্ণ দে, দুর্গাচরণ রক্ষিত, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, অদ্বৈতচরণ মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম শুনা যায়।

পূর্ব্বকালে কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কথক, যাত্রাওয়ালা এখানে যত ছিল এত আর কোথাও ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ রাসু, নৃসিংহ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা ; চিন্তে মালা, নবীন গুঁই প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালা ; রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক এবং মদন মাষ্টার, বৌ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী, ব্রজ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। এই সহরে এতাবৎ যতগুলি শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, লেখক ও গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যত্র তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকত্রয়ের অন্যতম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক গ্রন্থ চন্দননগরের পাদরি গেরাঁ (J. F. M. Guerin M. A. S.) দ্বারা শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি ভারতচন্দ্র রায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড, বর্ম্মার রাজকুমার মাইন্‌গুন্, ম্যাডাম্ ওয়াটস্, জাল প্রতাপচাঁদ, জন্ বৃষ্টো (John Bristow), মহারাজ নন্দকুমার, বৈকুণ্ঠ মুন্সি, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়াছেন। বিশপ কুরি (Daniel Currie), হিবার (Reginald Heber), গ্রাঁপ্রে (L. De Grandpre), ষ্টাভোরি-

নাস্ (Stravorinus), হ্যামিল্টন্ (Hamilton) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পর্য্যটক-গণও এ স্থানে আসিয়াছিলেন।

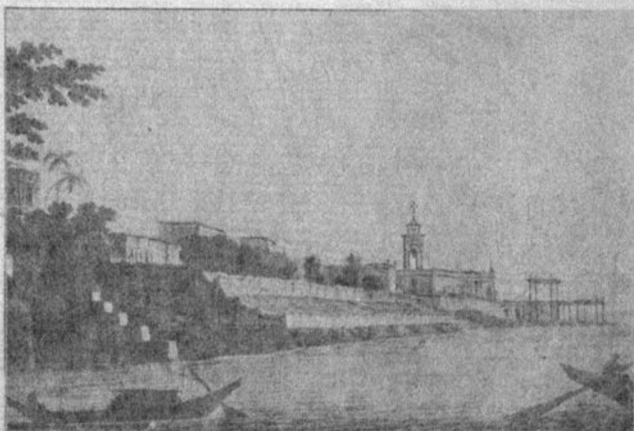
পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন আর অল্পই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানির সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি', ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জ্জা; শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ৎখানা বাগানের ডাচ নির্ম্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা (Fete National), যাদুঘোষের রথ ও বারোয়ারির সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাও বহু দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যাস্তার উৎসব হইয়া থাকে।

মানচিত্রে চুঁচুড়া চন্দননগরের ঠিক পরে দৃষ্ট হইলেও, বৃটিশ চন্দননগর নামে আর একটি স্থান দেখা যায়। এই স্থানের প্রাচীন স্বতন্ত্র ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। ইহা ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিক কোন্ সময় কি প্রকারে ইহা হস্তান্তরিত হয়, তাহা জানা যায় না। কেবল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের সীমা নির্দ্ধারণার্থ ফরাসী ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এক একরারনামার দ্বারাই পাকা রকমে ইহা ফরাসী চন্দননগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। (৩০) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশম আইন অনুসারে ইহা পরে হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। এখান-কার প্রসিদ্ধ লোকের মধ্যে আত্মারাম সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ কিঙ্কর সেন এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানকার ঘোষ বংশও প্রাচীন এবং খ্যাতিপন্ন।

ওলন্দাজদের অধিকারে আসার পর হইতেই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ইহার

(৩০) Aitchison's Treaties, Engagements and Sanads.

পূর্ব্বের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ গাস্‌টেভাস নামক দুর্গ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্‌ ও চন্দননগরের ফোর্ট দে আরল্যাঁ দুর্গের সমসাময়িক এবং শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বহু ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যাইলেও, উহার দক্ষিণ ফটকে ১৬৯২ এবং উত্তর ফটকে ১৬৮৭ লেখা ছিল। ষ্টাভোরিনাস্‌ ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে স্বচক্ষে



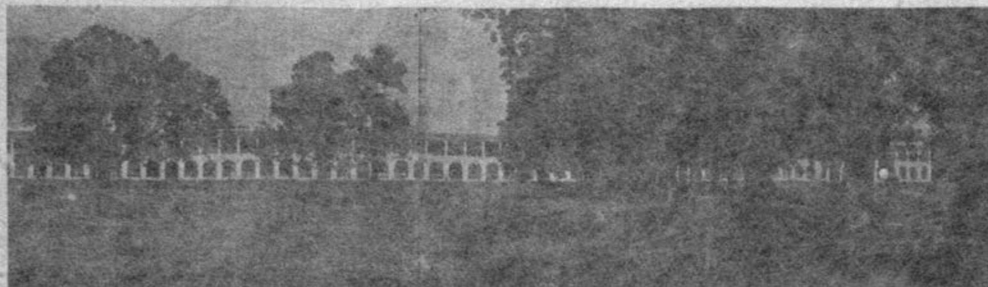
ওলন্দাজের সময় চুঁচুড়া

যে দুর্গ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় একটি স্বতন্ত্র দুর্গ পূর্ব্বে ছিল।

এখানে প্রথম একজন গভর্ণর ও সাতজন কাউন্সিলের সভ্য লইয়া কোম্পানি গঠিত হয়। তন্মধ্যে পাঁচজনের মাত্র ভোট দিবার অধিকার ছিল। তৎকালে গভর্ণর ভিন্ন অন্য কাহারও পাল্কি চড়িয়া বেড়াইবার অধিকার ছিল না। গভর্ণরের বিলাসিতা প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলিতে হইলে, কর্ণেল ফোর্ডের অধিনায়কত্বে বৃটীশ সৈন্যের সহিত ওলন্দাজ সৈন্যের যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাই উল্লেখযোগ্য। ফরাসীদের ন্যায় ওলন্দাজরাও এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারাইয়াছিলেন। নচেৎ দেশ ইংরাজ শাসনে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধনৈশ্বর্য্যে তাঁহারাই ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহারা প্রথমাবধিই এখানে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া ১৭৭০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত উহার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তখন ইয়োরোপে রপ্তানি ব্যবসায়ে এখানকার যত না লাভ ছিল, জাভার সহিত অহিফেনের ব্যবসায়ে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে লাভ ছিল। পাটনা হইতে তাহারা বৎসরে যে ৮০০ বাক্স অহিফেন পাইত, তাহা ব্যাটেভিয়ায় পাঠাইয়া বৎসরে প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ করিত। এই স্থান বরাবরই ব্যাটেভিয়ার অধীন ছিল এবং তথা হইতে এখানকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসিত।

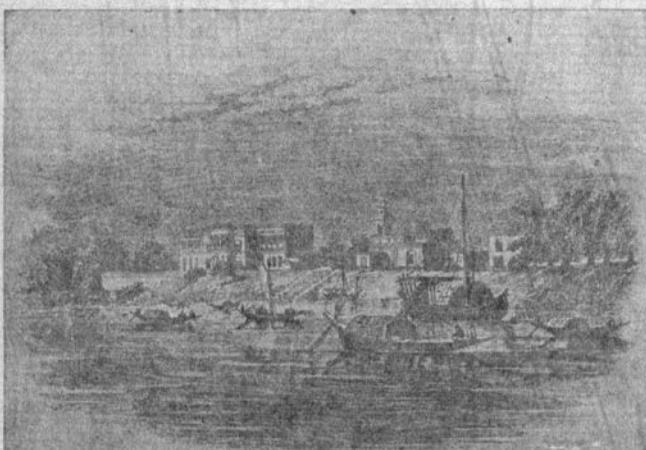
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজ কোম্পানির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে এবং ক্রমে এই উপনিবেশ রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। অবশেষে ইংরাজি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই বৃটীশদের সুমাত্রা দ্বীপের পরিবর্ত্তে ওলন্দাজেরা মালকা ও চুঁচুড়া তাঁহাদিগকে দান করেন। ইংরাজ হস্তে আসার পর দুর্গ ও গভর্ণমেণ্ট-ভবন বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয় এবং তৎস্থানে বর্ত্তমান ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যাণ্ট ক্রম্‌লিন্ (Lieutenant J. A. C. Crommelin) দ্বারা আরম্ভ হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেল্ (Captain W. Bell) দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। উহার মধ্যে এক সহস্র লোকের থাকিবার উপযুক্ত স্থান রাখা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে সৈন্য থাকিত। এতাদৃশ দীর্ঘ অট্টালিকা বাঙ্গালার মধ্যে অল্পই আছে।



চুঁচুড়ার গোরাবারিক

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচুড়ার গভর্ণর কর্ত্তৃক টানাপাখার প্রচলন হয়। (৩১) তৎকালে কাচের শার্সির প্রচলন ছিল না। চুঁচুড়ায় সে সময়ে প্রধান অট্টালিকাসমূহে উহার পরিবর্ত্তে বেত বুনিয়া সে কার্য্য সাধন করা হইত।

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সাধারণ অট্টালিকা হিসাবে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে



পুরাতন গির্জ্জা ও হুগলী কলেজ—চুঁচুড়া

আরমানীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত খৃষ্টান উপাসনা-মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার ধারের গির্জ্জাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিঃ সিয়ারম্যান্ (Mr. Sich-

(৩১) কয়েকজন গ্রন্থকার এই মত প্রকাশ করিলেও Col. Yule ও Mr. Burnellএর Anglo Indian Termsএর Glossaryতে দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবে ইহার ব্যবহার ছিল। কিন্তু প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে ফোর্ট উইলিয়মের একটি নীচু ঘরে একজন কেরাণী গরম ও মশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া টানাপাখা আবিষ্কার করেন।

terman) ও ভারনেট্ (Mr. Vernet) প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোরস্থানটিও পুরাতন। হুগলী কলেজ হুগলী জেলার একটি গৌরব। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় দানশীল মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের অন্যতম কীর্ত্তি। ইনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই বিদ্যালয় ও

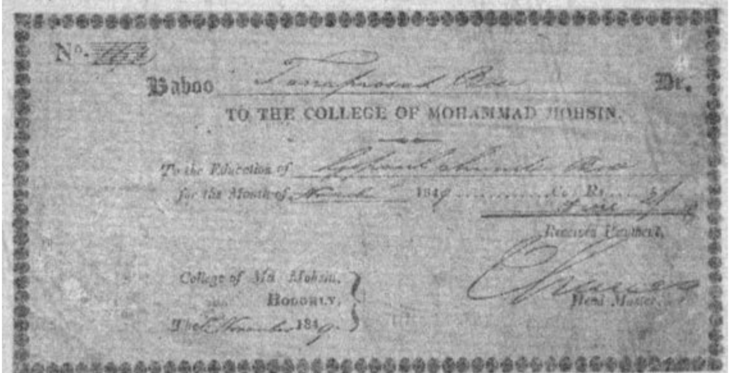


হাজি মহম্মদ মহসীন

একটি এমামবাড়া প্রতিষ্ঠার জন্য বাৎসরিক অর্দ্ধলক্ষেরও অধিক টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যুবকদিগের উচ্চশিক্ষা লাভার্থ এরূপ

বিদ্যালয় খুব কমই ছিল। তখন ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেই খ্যাত ছিল। পূর্ব্বের কাগজপত্রে এই নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিরূপে তৎপরিবর্ত্তে হুগলী কলেজ নাম হইয়াছে তাহা জানা যায় না। বঙ্কিম বাবু এই কলেজ হইতেই প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ। (৩২) হুগলী কলেজের বাড়ীটিরও পূর্ব্ব-ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ইহা মঁসিয়ে পেরন্ (Mons. Perron) নামক



No.

Baboo Dr.

TO THE COLLEGE OF MOHAMMAD MOHSIN.

To the Education of

for the Month of 184 Co. Rs.

Received Payment,

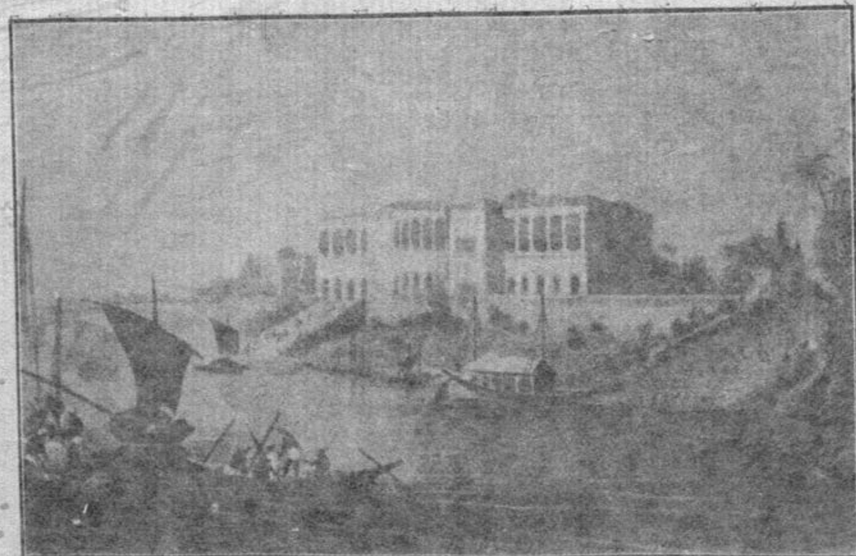
College of Md. Mohsin,
Hooghly,
The 184

Head Master.

মহম্মদ মহসীন কলেজের একখানি বিল—১৮৪৯

একজন ফরাসী সেনাপতির দ্বারা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সামান্য সৈনিকরূপে এ দেশে আসেন। পরে মহারাষ্ট্রীয়দের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বহু ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮০৩ হইতে ১৮০৫ পর্য্যন্ত তিনি চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। এই বাটী নির্ম্মাণের পরই তিনি ইয়োরোপে যাত্রা করেন। তখন উহা প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক এক

(৩২) The Life of Ram Tanu Lahiri.



হুগলী কলেজ (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)

বিলাসী ধনাঢ্যের হস্তগত হইয়া, তাঁহার বৈঠকখানা বা নাচবাড়ী রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক্ষণে যে সুবৃহৎ মুসলমান বোর্ডিং আছে, উহা উক্ত হালদার মহাশয়ের পূজার বাড়ী ছিল। তৎপরে ইহা স্থানীয় ধনী জগমোহন শীলের হস্তগত হয় এবং তাঁহার নিকট হইতে ২০,০০০৲ টাকা মূল্যে ইহা কলেজের জন্য ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলেজ খোলা হয়। টমাস্ ওয়াইজ (Dr. Thomas A. Wise) নামক স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ইহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিঃ অলিভার কর্ত্তৃক যে বিখ্যাত জরিপ কার্য্য (Trignometrical Survey) আরম্ভ হয়, তাহার প্রথম কার্য্যের জন্য এই অট্টালিকার সু-উচ্চ ও সুপ্রশস্ত ছাদ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

এমামবাড়ার কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, উহা হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়ায় যে এমামবাড়া হাসপাতাল নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, উহার ব্যয় এমামবাড়ী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উহাও উল্লিখিত ডাক্তার ওয়াইজ কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে।

এখানকার গ্রাম্যদেবতা শ্রীশ্রী৺ষণ্ডেশ্বর জীউ নামক মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল বা প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন কবির রচনায় এই দেবমন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।

এখানে যে সব প্রসিদ্ধ বৈদেশিক লোক বাস করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশনরি সুপ্রসিদ্ধ কিরনাণ্ডার (Kiernander) এবং চার্লস্ ওয়েষ্টন্ (Charles Weston) নামক অন্ধকূপ-হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ হলওয়েল্ সাহেবের বন্ধু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রতিমাসের প্রথম দিনে নিজ হস্তে ষোল শত মুদ্রা দীনদুঃখীদিগকে দান করিতেন।

স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ও বঙ্কিম-যুগের সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর মহাশয়ের



৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আবাসস্থান এইখানেই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শীল, মণ্ডল,

লাহা, দত্ত প্রভৃতি সুবর্ণবণিক ও ষণ্ডেশ্বরতলার সোমবংশ প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বিখ্যাত লাহা মহাশয়েরা চুঁচুড়ার লাহা-বংশ সম্ভূত।



৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়



ভূদেববাবুর বাটী—চুঁচুড়া

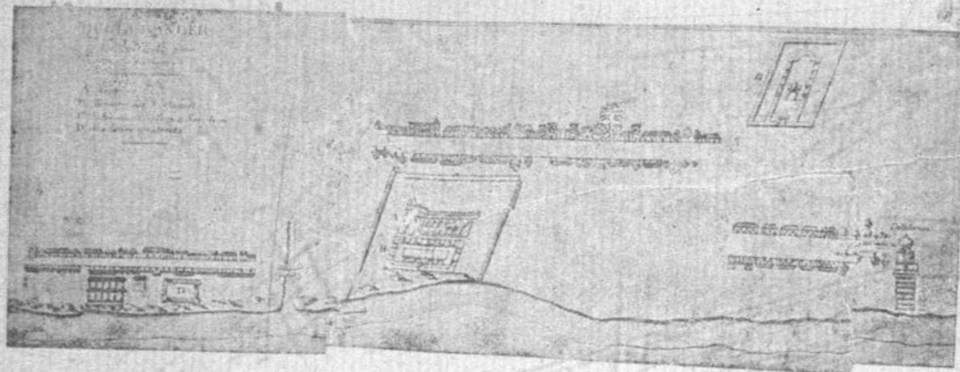
শোনা যায়, কলিকাতায় মাধবদত্তের বাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট যে মাধব

বাবু ছিলেন, তিনিও এখানকার দত্তবংশ-সম্ভূত। সোমেরা বাগাটি হইতে প্রথমে চন্দননগর, তারপরে চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামচরণ সোম ওলন্দাজ কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানি তাঁহাকে বাবু উপাধি দিয়াছিলেন। এই বংশের দয়ালচন্দ্র সোম চিকিৎসা-বিদ্যায় ও শিবচন্দ্র সোম শিক্ষকতা কার্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। (৩৩)

চুঁচুড়ার পরই হুগলী। ভাগীরথী-তীরে যে কয়টি নগরীতে ইয়োরোপীয় জাতিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অপর সকল স্থানের অপেক্ষা প্রাচীন। পোর্টুগীজেরাই এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইঁহার পরিচয়। তৎপূর্ব্বে এই স্থানের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সেই সময় ইহা একটিনগণ্য স্থান ছিল।

পুরাতন গ্রন্থাদিতে হুগলী গালিন্, ওগোলি, ওগ্লি, গলি, হুবলে, হিউগলি, হাগলে প্রভৃতি বহু ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই অংশে ভাগীরথীর তীরে জলের ধারে অনেক হোগলা গাছ জন্মিত। তাহা হইতে হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হুগলীর মধ্যে ব্যাণ্ডেল, বাবুগঞ্জ, পিপুলবাতি প্রভৃতি কতিপয় পল্লী আছে। পোর্টুগীজদের এখানে আসার সময় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাম্প্রায়ো (Samprayo) বা স্যাম্পায়ো নামক এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া নবাবের অনুমতি লইয়া একটি কুঠি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া-

(৩৩) নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে চুঁচুড়ার বিবরণ লিখিত হইল— (ক) Hooghly Past and Present. (খ) Notes on the Right Bank of the Bhagirathi—Calcutta Review Vol VI. (গ) Hooghly District Gazetteers. (ঘ) Carey's Good Old Days. (ঙ) A Brief History of the Hooghly District. (চ) Rural Life in Bengal.



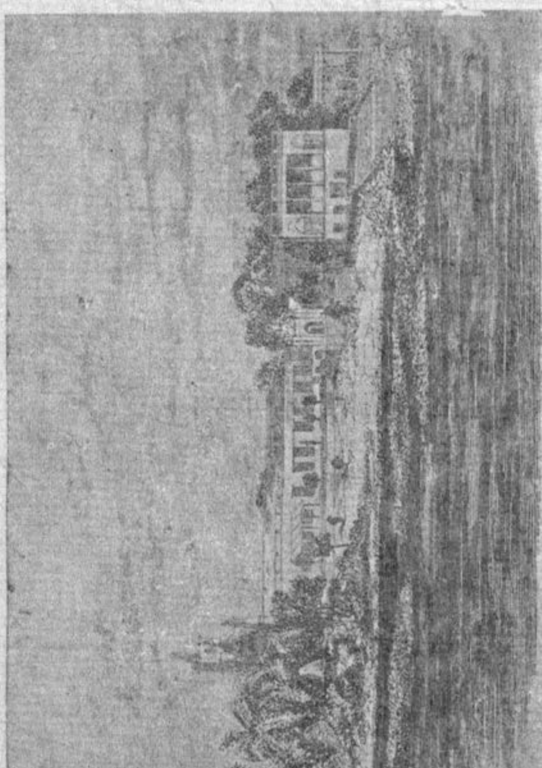
টিফেণ্ডারের প্রস্তুত প্রাচীন হুগলীর নক্সা

ছিলেন। (৩৪) ওম্যালি (L. S. S. Omalley) সাহেব বলেন, ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এখানে আসিয়াছিলেন। (৩৫)

খৃষ্টান-নির্ম্মিত বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম নির্ম্মিত সৌধ—ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহারা এই ব্যাণ্ডেল নামক স্থানটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীরাও চন্দননগরে পাকা রকমে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে কিছুদিনের জন্য ছিলেন। পরে এখানে আশ্রম-সংলগ্ন আর একটি গির্জ্জা আগষ্টিনিয়ানরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি জেসুটদের কলেজ ও কনভেণ্ট্ ছিল। স্থানটি পূর্ব্বে অতি স্বাস্থ্যকর ছিল এবং পোর্টুগীজদের সময় হইতে এখানকার পনির অতি বিখ্যাত। ব্যাণ্ডেল নামটি বন্দরের অপভ্রংশ।

হুগলী পোর্টুগীজদের হস্তে অতি সত্বর উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতিই তাঁহাদের অনিষ্টের অন্যতম কারণ হয়। পোর্টুগীজদের এখানে ব্যবসায়ের প্রাবল্য হেতু, পুরাতন সাতগাঁ বন্দরের যথেষ্ট ক্ষতির জন্য, ছোট ছোট বালক-বালিকাদের খরিদ করিয়া বা গোপনে ধরিয়া লইয়া ভারতের অন্যত্র কৃতদাস-রূপে বিক্রয়ের জন্য ও পোর্টুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার জন্য, মোগল সরকার বিশেষ ক্রুদ্ধ হন; এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের আদেশে কাশিম খাঁ হুগলী আক্রমণ করেন। (৩৬) পোর্টুগীজরা সার্দ্ধ তিন মাস কাল প্রবল বিক্রমে মোগল সৈন্যদের গতিরোধ করিয়াছিল। এই সময় চৌষট্টিখানিরও অধিক বৃহদায়তনের তরী ও দুইশত খানি স্লুপ গঙ্গাবক্ষে

(৩৪) Hooghly Past and Present.
(৩৫) Hooghly District Gazetteer.
(৩৬) Hooghly Past and Present.



পুরাতন ব্যাণ্ডেল—হুগলী

নোঙ্গর করা ছিল। ইহার মধ্যেও তিনখানি পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপর সমস্তগুলির জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। গির্জ্জার অভ্যন্তরে যে সব চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সজ্জিত ছিল, তাহা সমস্ত নষ্ট করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে এক সহস্র পোর্টুগীজ হত এবং চারি সহস্র বন্দী হয়। এই বন্দীদের মধ্য হইতে সমস্ত যাজক এবং পাঁচশত সুশ্রী বালক-বালিকাকে আগরার রাজ-দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় দুর্গ ও ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা ধ্বংস করিয়া তাহার সমস্ত নথিপত্র নষ্ট করা হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত যাজকদের মধ্যে ডিক্রুজ (Father De Cruz) নামক এক ব্যক্তি বাদশাহের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া গির্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ও তৎসহিত ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। পরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ সোটোর (Gomes de Soto) দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়।

মুসলমানরা হুগলীতে পোর্টুগীজদের পরাজিত করার পর পঞ্চদশ শত বৎসরের বাণিজ্য-সম্পদে সম্পদশালী সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতেই বাঙ্গালার রাজকীয় বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্দর ও মোগল কর্ম্মচারীদের আবাসস্থান হইল। সরকারী দপ্তরখানা সকল তথা হইতে এই স্থানে উঠিয়া আসিল। ক্রমে সাতগাঁ একটি সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত হইল এবং তৎসঙ্গে হুগলীর পুনরুন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরাজগণ—যতদিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থান লাভ না হইয়াছিল, ততদিন—এই স্থানেই ব্যবসা করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকগণ উভয়েই ঘোলঘাট নামক স্থানে তাঁহাদের কুঠি বা কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে পাশ্চাত্য বণিকগণের এই স্থান ত্যাগের সহিত ইহা পুনরায় দ্রুত অবনতির পথে নামিতে লাগিল। এই সময় মোগল শাসনকর্ত্তা হুগলীতে বাস করিতেন।

তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটে একটি বাজার ছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর এই বাজারে ইংরাজ সৈন্যের সহিত নবাবের পেয়াদাদের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ চারনকের (Job Charnock) সহিত শাসনকর্ত্তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তিনি হুগলী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়েই (১৬৯০এর আগষ্ট মাসে) চারনক্ সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করিয়া কলিকাতা নগরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরাজ বণিকদের হুগলী ত্যাগের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ক্লাইব এই স্থান আক্রমণ করেন এবং ১৬ই তারিখে দুর্গ ধ্বংস করেন। এই সময় হইতেই হুগলীর উন্নতির পথ চিরঅবরুদ্ধ হয়। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র খ্যাতনামা নবাব খাঁজেহান খাঁ উক্ত দুর্গ মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন। ষ্ট্রাভোরিনাস্ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে হুগলীর মধ্যে নবাবের এই বাড়ী ও হস্তীশালা ভিন্ন বিশেষ দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। খাঁজেহান খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি বরাবর এই ভবনে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা ধূলিসাৎ করিয়া মোগল দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করা হয়। ঐ বাটীর ভগ্নস্তূপ শেষে দুই সহস্র টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা ভিন্ন হুগলীর ইমামবাড়া, ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও জুবিলি ব্রীজ এখানকার দ্রষ্টব্য। হাজি মহম্মদ মহসীন তাঁহার মৃত্যুকালীন দানপত্রের দ্বারা যে অগাধ সম্পত্তি দিয়া যান, তাহার অংশ হইতেই এই মহাকীর্ত্তি ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

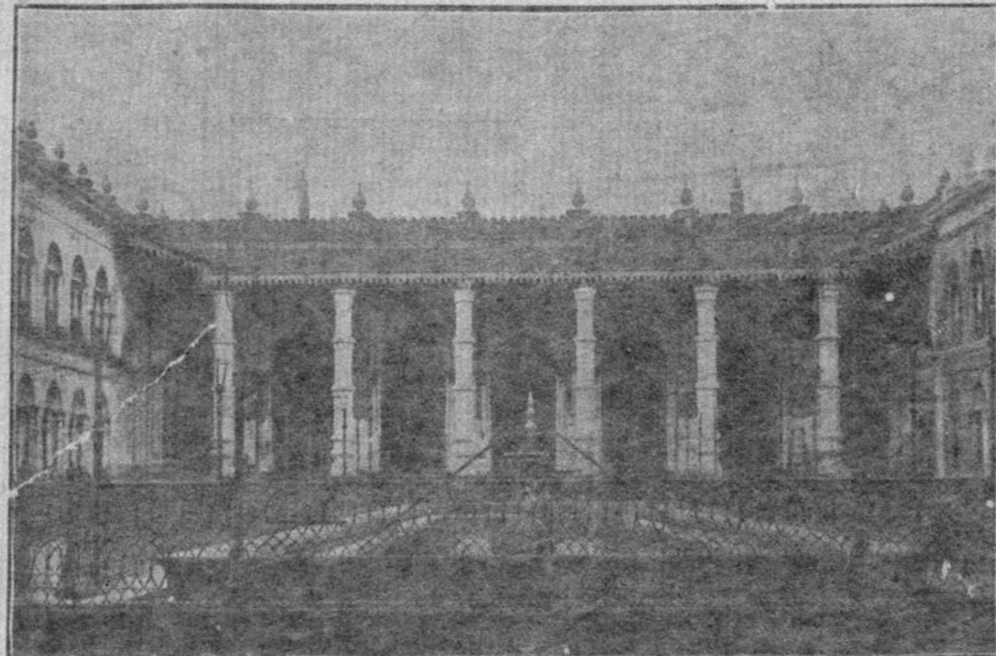
ইহা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৬১তে মোট প্রায় পৌনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাধা হয়। গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্ম্মাণে প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা এবং বিলাত হইতে ঘড়ি আনাইতে ১১,৭২১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কথিত আছে, যেস্থানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায়



ইমামবাড়ী—হুগলী

একটি পুরাতন ইমামবাড়া ছিল। উহা ১৬৯৪ অথবা অন্য মতে ১৭১৭তে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রীজ নির্ম্মাণ কার্য্যে মোট ৯০,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উহা লম্বে ১২০০ ফিট্।

মোগলটুলির গলিতে আর একটি ইমামবাড়া ছিল। উহা চুঁচুড়ার



হুগলীর ইমামবাড়ীর ভিতরের দালান

হাজি কারবালা নামক একজন পারস্য দেশীয় ধনী বণিকের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একখানি উইল দ্বারা হুগলীর পশ্চিমাংশে কাশীমপুর ও বাঁশবেড়িয়া লাখেরাজ সম্পত্তি উহার জন্য দান করিয়া যান। প্রথমোক্ত কাশীমপুর নাম মল্লিক কাশীমের নাম হইতে হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে—দিল্লীর এক মুসলমান সম্রাট বাঙ্গালা দেশকে 'দোজাক' অর্থাৎ নারকী প্রদেশ মনে করিতেন। যখন কোন আমির ওমরাহ বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিতেন, তখন তাঁহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা না হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। মল্লিক কাশীম একজন সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ১৬৮৪ হইতে প্রায় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হুগলীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নামে আজিও হাট চলিতেছে। (৩৭)

হুগলীতে বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া উহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। উইল্কিন্স্ (Charles Wilkins) পঞ্চানন কর্ম্মকার ও তাঁহার সহকারী মনোহর দাসের সহায়তায় বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর খোদাই করিয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। আমেরিকা হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বরফ এদেশে প্রথম আসে। তৎপূর্ব্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত। যেখানে উহা হইত তাহাকে এখনও বরফ-তোলার মাঠ বলে। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদ ঘটিত বিখ্যাত মোকদ্দমা এইখানে হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের সহিতও এই স্থানের ইতিহাস বিজড়িত।

(৩৭) The Banks of the Bhagirathi—Calcutta Review, Vol. VI—1846

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টি হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্মিথের চেষ্টায় বর্দ্ধমানের রাজা, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উহার বাড়ী নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বিদ্যালয় খোলা হয়। চাঁদা দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় প্রথম প্রথম লোকে উহাকে চাঁদার স্কুল বলিত। উহার প্রথম প্রধান শিক্ষকের নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কতিপয় সমৃদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক-বংশ খুব বড় এবং প্রাচীন। এই বংশের ব্রহ্মমোহন মল্লিক, চৌধুরী-বংশের ডাক্তার বদনচন্দ্র ও মিত্র-বংশের ঈশানচন্দ্র বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকটা আধুনিক। সেন-বংশের গৌরী সেন একজন বঙ্গ-বিশ্রুত ব্যক্তি। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি হুগলীর মধ্যে বালি নামক স্থানে বাস করিতেন। এ স্থানের বিখ্যাত মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে খাঁ জেহান খাঁ, কাশীম মল্লিক আলি খাঁ বা মল্লিক কাশীম ভিন্ন মির্জ্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ, খোজা ওয়াহেদ, হাজি কারবেলা মহম্মদ, আশাতুল্লা মিঞা, হাজি মহম্মদ মহসীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা দ্বারা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে ব্যবসার মধ্যে সোরা, লবণ, রেশম, বস্ত্র, অহিফেন, চিনি প্রভৃতিই প্রধান ছিল।

প্রসিদ্ধ বৈদেশিকগণ, যাঁহারা পূর্ব্বকালে এখানে সময় সময় বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তৎকালীন পাশ্চাত্য সুন্দরীগণের প্রধান মাদাম্ গ্র্যাণ্ড (ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দ্বিতীয়া পত্নী), সুপ্রসিদ্ধ এলিগ্যাণ্ট মেরিয়ন্ (Elegant Marian), মিঃ রস্ (Mr. Ross) প্রভৃতির কথা জানা যায়। প্রথম ইংরাজ পর্য্যটক ফিচ (Ralph Fitch) পারকাশ

(Purchas), হ্যামিল্টন্ (Hamilton) প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। (৩৮)

হুগলী ও ব্যাণ্ডেলের পর কেওটা নামক একটি বৈশিষ্ট্যশূন্য সামান্য পল্লী আছে। ইহার পূর্ব্বকথা কিছু জানা যায় না। হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্মিথের (D. C. Smith) এখানে একটি বাগানবাড়ী ছিল। তিনি ঐ বাটীতে এবং এখানকার সারকিট্ হাউস্ নামক ঐতিহাসিক বাটীটিতে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। তৎকালে বিচারপতিগণের স্থানে স্থানে গিয়া তথায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক বিচার কার্য্য সমাধা করিবার প্রথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট বাড়ী থাকিত। ইহাও একটি সেইরূপ বাড়ী। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৬০০০৲ টাকায় উহা ক্রীত হয়।

এই স্থানের উত্তরে সাগঞ্জ। সাগঞ্জ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও, ইহার পূর্ব্ব-ইতিহাস ও প্রসিদ্ধির কথা জ্ঞাতব্য। ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে মোগল-শাসনকালে এই স্থানে একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে তাঁহার পৌত্র আজিম ওশ্মান সা যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন এই স্থানটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া উহা সা আজিমগঞ্জ নামে পরিচিত হয়। পরে সংক্ষিপ্ত হইয়া সাগঞ্জ নাম হইয়াছে।

(৩৮) (ক) Hooghly Past and Present.
(খ) District Gazetteers—Hooghly.
(গ) Good Old Days of Honourable John Company.
(ঘ) Notes on the Right Bank of the Bhagirathi.
(ঙ) A Brief History of the Hughly District প্রভৃতি হইতে হুগলীর কথা সংগৃহীত হইল।

এই স্থানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কেউটিয়া নামক গ্রাম হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ নন্দী-বংশই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি ও সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে এই বংশের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বীরেশ্বর নন্দী। লোকে সচরাচর তাঁহাকে বীরু নন্দী বলিত। আনুমানিক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কেউটিয়াতে জন্ম-গ্রহণ করেন। কথিত আছে, নন্দীদের আদি বাসস্থান রামেশ্বরপুরের নিকট নন্দীগ্রাম। বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার—বর্দ্ধমান জেলার জামগ্রামের নন্দী-পরিবার এই কেউটিয়ার নন্দীদের একটি শাখা।

পরবর্ত্তীকালে নন্দীদের পরিচয়েই সাগঞ্জের পরিচয়। কথিত আছে, বীরেশ্বরের সহিত তাঁহার পিতা তিলকরামের ব্যবসা বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায়, পিতার কোন অর্থ গ্রহণ না করিয়া বীরেশ্বর সাগঞ্জে আসেন, এবং নিজ চেষ্টায় কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রথমে রামরাম ঘোষ নামক একব্যক্তির সহিত একত্রে একখানি সামান্য দোকান করেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে মুরশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, আটয়ারি, পচাগড়, বালিগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে ব্যবসা, এবং বান্দাপাড়া, গরুটী, রায়নপুর প্রভৃতি স্থানে লবণের কারখানা স্থাপন দ্বারা বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মির্জ্জা রসনআলি নামক সুপ্রসিদ্ধ জমিদারের তিনি দেওয়ান ছিলেন। এই মুসলমান জমিদারের অবস্থান্তর ঘটিলে, তিনি তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান জমিদারী ক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হন। এমন কি, তাঁহার চাঁদনিবাগ নামক প্রকাণ্ড গড় ও আবাসবাটী পর্য্যন্ত পরে তাঁহার পুত্রদের হস্তগত হয়, এবং উহা পরে নন্দীদের বৈঠকখানা বাটীতে পরিণত হয়।

বীরেশ্বর ধনোপার্জ্জনে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মকর্ম্মেও

তেমনই তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল। শিবমন্দির, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, রথ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি বহু সৎকার্য্যের দ্বারা তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। বীরেশ্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র মধুসূদন ও অভয়াচরণ নন্দী যথেষ্ট আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন; এবং তদ্দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু কালের গতিকে সাগঞ্জের নন্দীবংশের এক্ষণে আর সে পূর্ব্ব-গৌরব নাই। (৩৯)

সাগঞ্জের পর বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে মিরকালা ও খামারপাড়া নামক দুইটি ছোট গ্রাম আছে। মিরকালা সাগঞ্জের একটি পল্লী বিশেষ। খামারপাড়ার মধ্যে কুণ্ডু-বংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির কথা ভিন্ন উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। এই কুণ্ডু-বংশের স্থাপয়িতার নাম অথবা পূর্ব্ব ইতিহাস জানা যায় না। রামকমল কুণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভুবনচাঁদ কুণ্ডু মহাশয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১২৩০ সালে ভুবনবাবু জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসা দ্বারাই এই বংশের উন্নতি হয়। রামকমল হুগলীতে বাবুগঞ্জ নামক স্থানে গুড়ের কাজ করিতেন। ভুবনবাবু বিবাহের পর শ্বশুরের সাহায্যে এই স্থানে প্রথম লবণের কাজ আরম্ভ করিয়া, পরে মুঙ্গের, পাটনা, সেকপুর, খাগড়িয়া, দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে মোকামি কার্য্য দ্বারা বহু ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হন। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং দানধ্যান ও পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে বহু ব্যয় করিতেন। (৪০)

খামারপাড়ায় দীর্ঘকাল হইতে পিত্তল কাঁসার কাজ বিস্তৃতভাবে হইয়া আসিতেছে।

(৩৯) (ক) সাগঞ্জের তিলি জাতির বিবরণ—তিলি-বান্ধব, ৫ম বর্ষ।
(খ) Hooghly Past and Present.

(৪০) ভুবনচাঁদ কুণ্ডুর জীবনী—তিলি-বান্ধব, ৩য় বর্ষ।

বংশবাটী হইতে বাঁশবেড়িয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানকার রাজা মহাশয়দের পরিচয়েই এ স্থানের পরিচয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের আদিপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত কনোজ হইতে মুরশিদাবাদের মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। এই বংশের দ্বারিকানাথ তথা হইতে কাটোয়ার সন্নিকটে পাটুলিতে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র সহস্রাক্ষ মোগল বাদশাহ আকবরের অনুগ্রহে বাঙ্গালা ৯৮০ সালে জমিদার বলিয়া ঘোষিত হন। তাঁহার পুত্র উদয় রাজা মানসিংহের কৃপায় সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং আকবরের নিকট হইতে বংশানুক্রমে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাঘব সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে সাতগাঁর অন্তর্ভুক্ত একুশখানি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন এবং ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে 'চৌধুরী' এবং পর বৎসর 'মজুমদার' উপাধি-ভূষিত হন। এই জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনিই সাতগাঁর সন্নিকটে ভাগীরথী-তীরে বাঁশবন পরিষ্কার করাইয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস স্থাপন করেন এবং গ্রামের নাম দেন বংশবাটী।

পুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ এখানে যে বিষ্ণুমন্দিরটি আছে, উহা ১৬৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাঘবের দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেব তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন; এবং তাঁহাদের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর দশ আনা এবং কনিষ্ঠ বাসুদেব ছয় আনা সম্পত্তির অধিকারী হন। এই সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বংশানুক্রমে 'রাজা মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত হন। রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়াতেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং বাসুদেবের পুত্র মনোহর সেওড়াফুলিতে যাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। উঁহাদের বাঁশবেড়ের বাটী গড়বেষ্টিত বলিয়া ইঁহাদিগকে লোকে গড়বাটীর রাজাও বলিয়া থাকেন।

এই বংশের রাজা নৃসিংহদেব একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি ১৭৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্য বাঙ্গালার একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় তন্ত্র ও কাশীখণ্ড তর্জ্জমা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন; এবং বাঁশবেড়িয়ার গৌরব ত্রয়োদশ-চূড় হংসেশ্বরী মন্দিরের



হংসেশ্বরী মন্দির—বাঁশবেড়িয়া

পত্তন তিনিই করিয়াছিলেন। উহা শেষ করার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা ত্যাগ করেন। কথিত আছে, তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন সহমৃতা হন। তাঁহার অপর

স্ত্রী রাণী শঙ্করী উক্ত মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া উহা ও চতুর্দ্দশেশ্বর দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কার্য্যে এবং তুলা-পুরুষ ব্রতাদিতে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়েরা পরে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের সে পূর্ব্বশ্রী এক্ষণে বহু পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। (৪১)

বাঁশবেড়িয়া গ্রামে অনেকগুলি অবস্থাপন্ন পরিবারের বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে অনেকে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার কুণ্ডু মহাশয়েরাও বহুদিনের সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদার। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস কোথায় ছিল, জানা যায় না। শুনা যায়, সাতগাঁ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, সেই সময় ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ কুণ্ডু ব্যবসা উপলক্ষে কয়েক ঘর স্বজাতিকে লইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র বলরাম কুণ্ডুর সময়ে কয়েকখানি তালুক খরিদ করা হয়। পরে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতিতে ও অন্যান্য আকস্মিক বিপদে ইঁহারা কতকটা হতশ্রী হইয়া পড়েন। এই বলরামবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ লক্ষ্মী দাসী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এ অঞ্চলে ইহাই শেষ সহমরণ। (৪২)

বলরামবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে জমিদারীর কার্য্য দেখিয়া উন্নতি করিতে

(৪১) (ক) The Bansberia Raj.
(খ) Bengal District Gazetters—Hooghly.

(৪২) বাঁশবেড়ের রাজা মহাশয়দের বাটীতে যে সহমরণ হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন তাহাই এই অঞ্চলের শেষ সহমরণ।

লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া নূতন ব্যবসা কার্য্য ব্রতী হইলেন এবং কতিপয় নীলকুঠী স্থাপন ও জোড়াসাঁকোর সিংহ মহাশয়দের বাঁশবেড়িয়ার নীলকুঠী ইজারা লইয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে সাগঞ্জের নন্দী মহাশয়দের তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই কুণ্ডুরা পূর্ব্বাপর বরাবরই সৎকর্ম্মরত এবং ধার্ম্মিক বংশ বলিয়া খ্যাত। (৪৩)

বাঁশবেড়িয়াতে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত শিক্ষার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১২।১৪টি টোল ছিল। (৪৪) ইট ও পিত্তল কাঁসার কাজের জন্য এই স্থান বহু দিন হইতে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী যাজক লইয়া খৃষ্টান উপাসনা-মন্দির এই স্থানেই প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। সেই যাজকের নাম তারাচাঁদ। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের নীলকুঠির স্থান এই বাঁশবেড়িয়া। এখানে পূর্ব্বে নীলের কাজ অনেক ছিল। অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মার্থ অনেকে গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন দিত বলিয়া জানা যায়। (৪৫)

বংশবাটী অতিক্রম করিয়া ত্রিবেণী। ইহাকে বংশবাটীর উত্তর সীমাও বলা যাইতে পারে। অধুনা ত্রিবেণী একটি সামান্য পল্লী হইলেও বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। ইহাকে মুক্তবেণী বলে এবং এই কারণে ইহা হিন্দুদের নিকটে অতি পবিত্র স্থান।

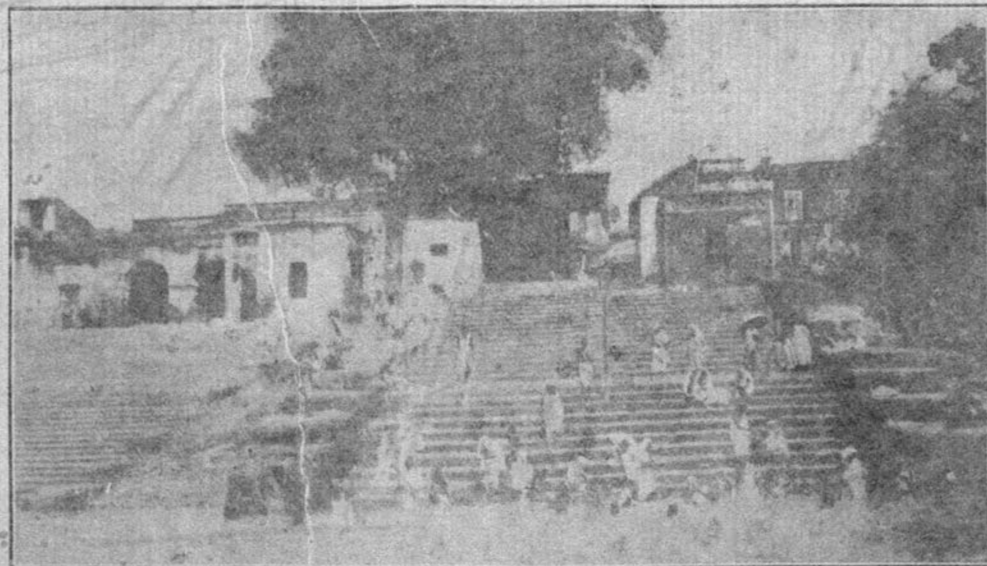
দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'পবন-দূতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারও বহু পূর্ব্ব হইতে ত্রিবেণী হিন্দুতীর্থ

(৪৩) বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাবুদের ইতিবৃত্ত—তিলি-বান্ধব, ৪র্থ বর্ষ।
(৪৪) Adam's Report on Vernacular Education.
(৪৫) Calcutta Review—Vol. VI—1845

বলিয়া খ্যাত। বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ইহাকেও ত্রিপানি, ত্রিভেনী, তারবানি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমুদ্রগামী জাহাজ সকল যাতায়াতকালে এই স্থানে নোঙ্গর করিত, ইহা বিপ্রদাস ও তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্লিনি (Pliny) ও টলেমি (Ptolemy) এই স্থানের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেজ (William Hedges) এবং ১৭৭০তে ষ্ট্রাভোরিনাস্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে ইহা একটি বিশিষ্ট ব্যবসা স্থান ছিল। এক সময় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, তখন এখানে ত্রিশটিরও অধিক সংস্কৃত বিদ্যালয় বা টোল ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রকাশের বিশেষ ভার তিনি লইয়াছিলেন। ১০৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বহুকাল হইতে এখানে মকর-সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু-সংক্রান্তি, বারুণি, দশহরা, কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতির সময়ে ও অর্দ্ধোদয় যোগাদি উপলক্ষে বহু লোকসমাগম হয় ও একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিবেণী এখনও তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, পুরাতন দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নাই। ত্রিবেণীর ঘাট ও তাহার অনতিদূরে সপ্ত শিব-মন্দির —ইহাই এখানকার প্রাচীন নিদর্শনের অবশিষ্ট আছে। এই ঘাটটি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ দেব দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিবেণী উড়িষ্যার মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র নামক জনৈক হিন্দু রাজার হস্তগত হয় বলিয়া জানা যায়।

এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে পাঁচটি ডোম-বিশিষ্ট জাফর খাঁ গাজির সমাধি ও মসজিদ অন্যতম। মসজিদটি ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া উহার উপাদান হইতে



ত্রিবেণী ঘাট



জাফরখাঁ গাজীর মসজিদ—ত্রিবেণী

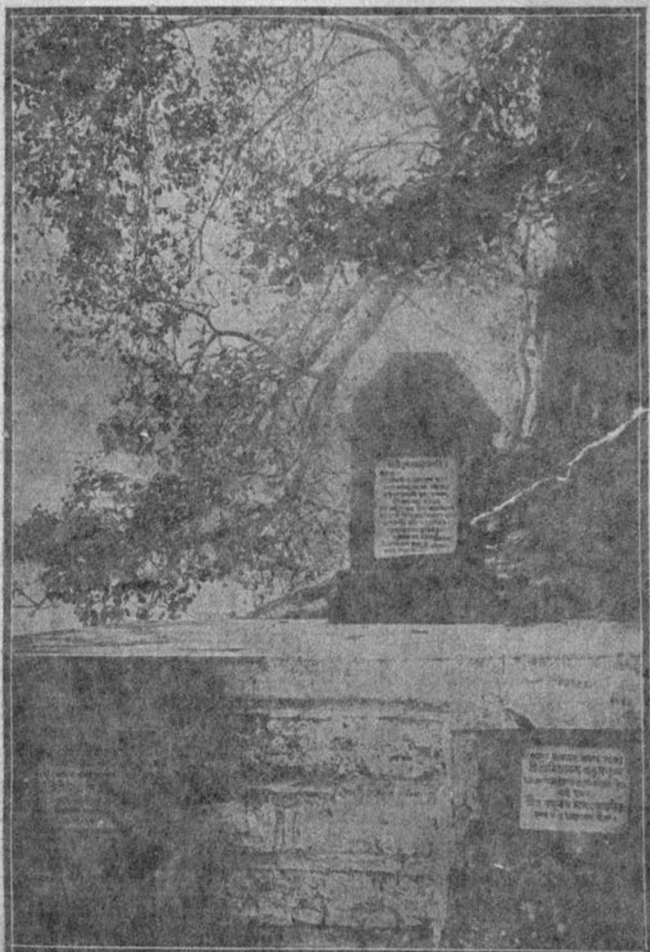
মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ এখনও তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাফর খাঁ পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সাহ স্থফির খুল্লতাত। এখানকার হিন্দু যাত্রীগণ এই সমাধি শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। কথিত আছে, জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারও সমাধি এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুনা যায়, জাফরখাঁ মুসলমান হইলেও গঙ্গা দেবীর পূজা করিতেন। (৪৬)

(৪৬) (ক) Bengal District Gazetteers—Hooghly.
(খ) The Banks of the Bhagirathi—Calcutta Review—1846.
(গ) Satgaon and Tribeni—Bengal Past and Present.

গঙ্গার পূর্ব্ব দিক

দক্ষিণেশ্বর হইতে কুলেরপাট





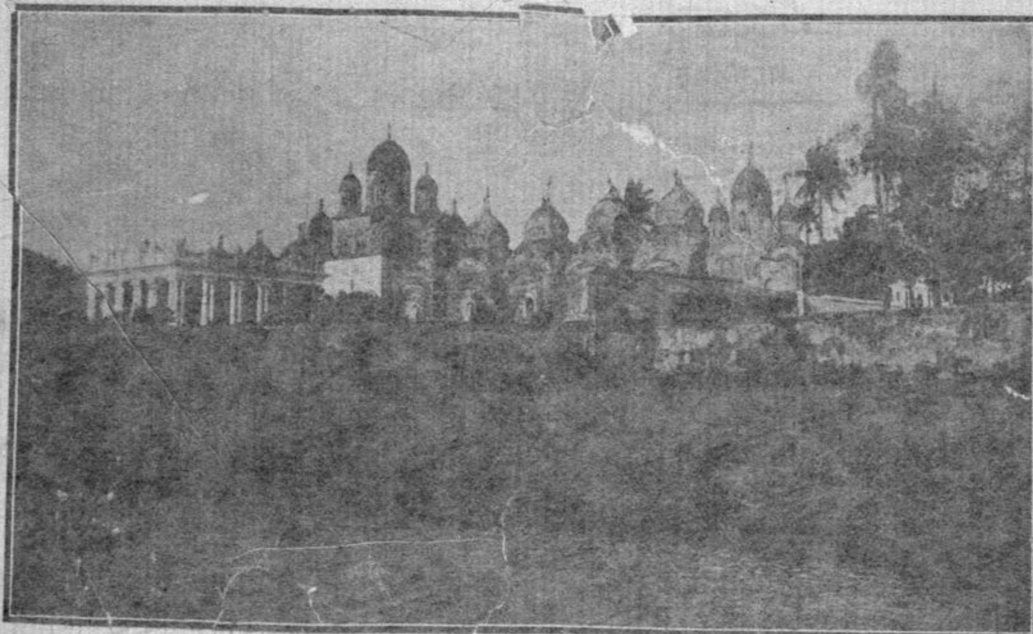
২। বটবৃক্ষ—পাণিহাটী



৩। রাঘব পণ্ডিতের মাধবীলতা ও সমাধি—পাণিহাটী



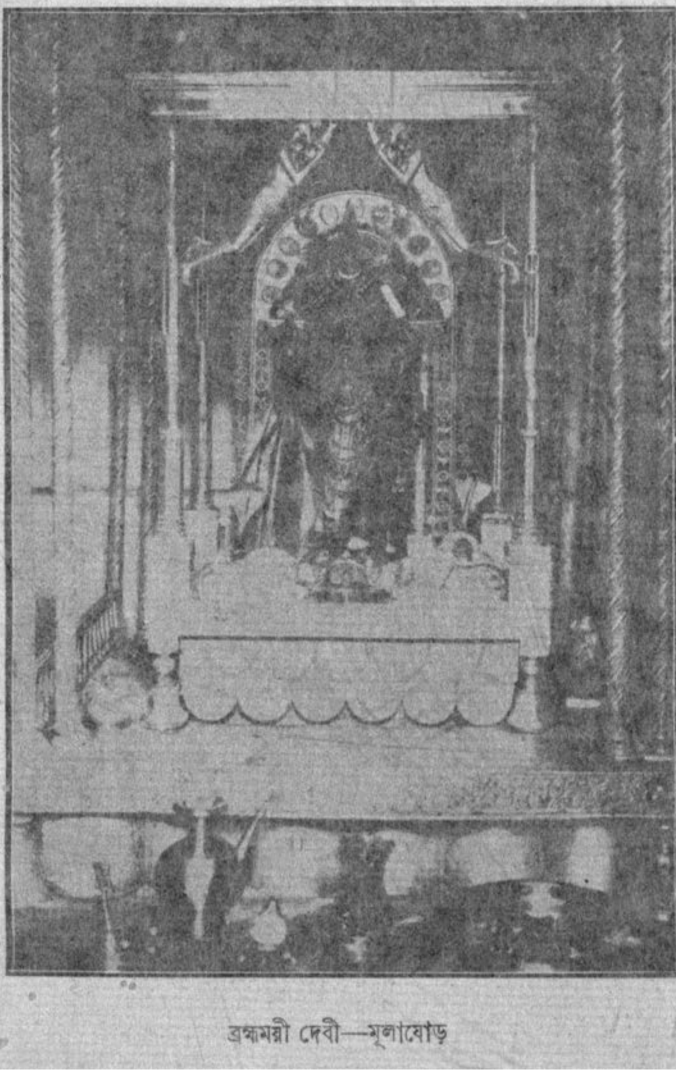
৪। নেড়ানেড়ির মেলাস্থা—খড়দহ



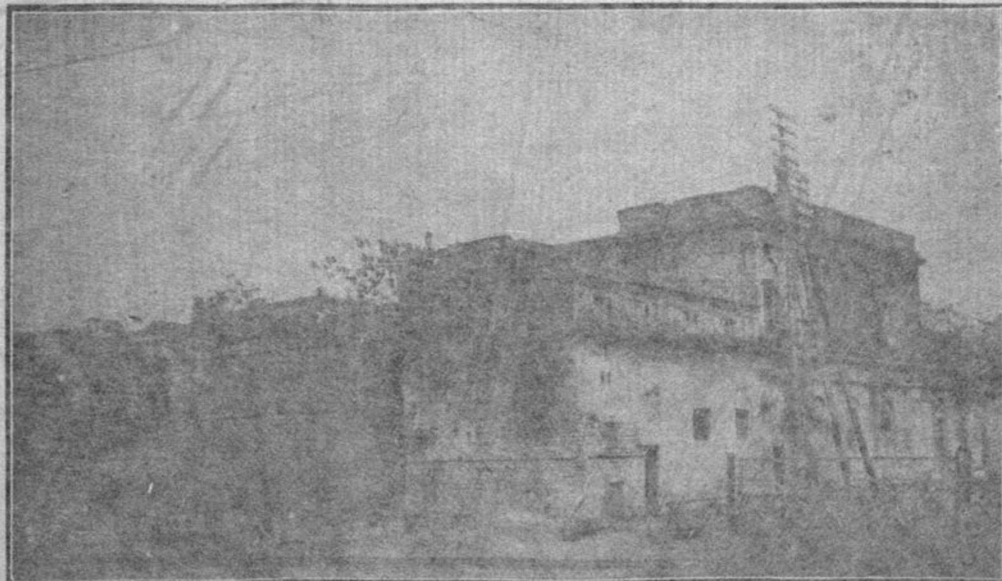
৫। কালীমন্দির—মূলাবোড়

৺ব্রহ্মময়ী দেবী

কলিকাতার অনতিদূরে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের শ্যামনগর ষ্টেসনের নিকটেই মূলাযোড় অবস্থিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মূলাযোড়ে এই ব্রহ্মময়ী কালীমূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীমোহন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। তিনি তাঁহার পিতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কলিকাতা হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে ইনি যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে ইঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গবর্ণর থাকিবেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি মূলাযোড়ে যে কালীমূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ব্যয়ের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তির নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। তাঁহার স্থাপিত সংস্কৃত কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় এখনও তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কৃত কলেজের সহিত বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পণ্ডিত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের বিশেষ সংস্রব ছিল। তিনি কাশীধামে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখনও পৌষ মাসে মূলাযোড়ে ব্রহ্মময়ী দেবী দর্শনার্থ বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার দেবসেবা ও প্রতিষ্ঠানগুলির সুব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় মূলাযোড়ে যে অতিথিশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন, দেবদেবী সেবার ন্যায় সেই অতিথিশালার কার্য্যও সমভাবে সুপরিচালিত হইতেছে; যাত্রীরা কেহই প্রসাদে বঞ্চিত হয় না।



ব্রহ্মময়ী দেবী—মূলাযোড়



বঙ্কিমবাবুর বাটী—কাঁঠালপাড়া। ইহাই বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাসভবন



৬। বঙ্কিমবাবুর লিখিবার ঘর—কাঁঠালপাড়া



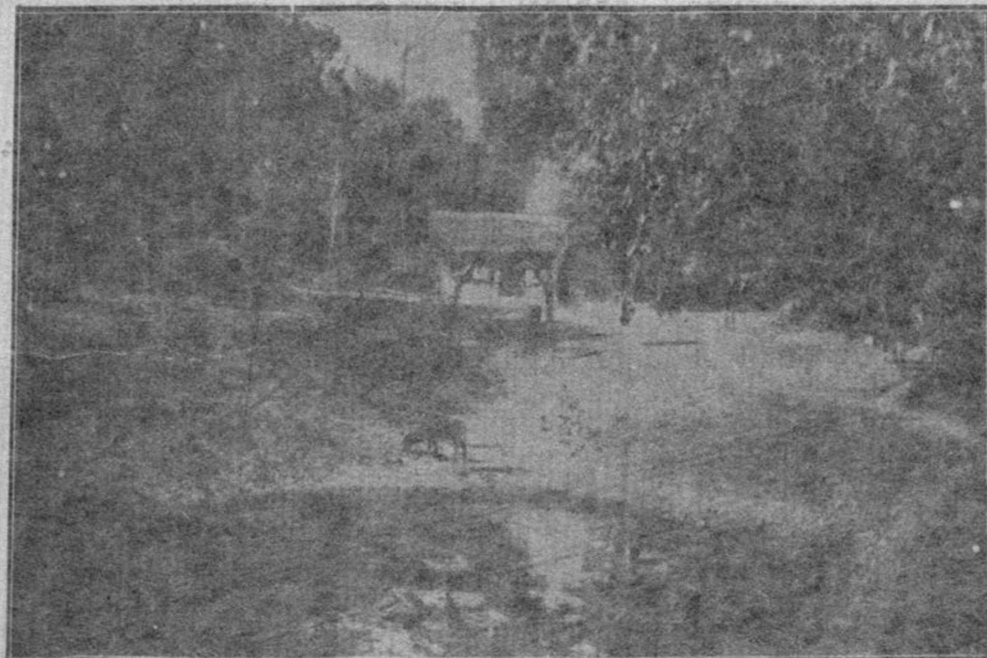
৭। হিমসাগর—ঘোষপাড়া



৮। ডালিম গাছ—ঘোষপাড়া



৯। আজু গোঁসায়ের ভিটা—হালিসহর্



১০। চৈতন্য ডোবা—হালিসহর



১১। রামপ্রসাদের পঞ্চবটী—হালিসহর

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে দেবানন্দ নামে একজন সচ্চরিত্র মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভক্তিতত্ত্ব মানিতেন না। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কুলিয়ায় বাচস্পতির গৃহে কয়েকদিনের জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন দেশ ভাঙ্গিয়া লোক তাঁহাকে দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছিল; হরিধ্বনিতে গ্রাম পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; জনতা এত বেশী হইয়াছিল যে, বাচস্পতির বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল। এই দেখিয়া দেবানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি এত দিন মহাপ্রভুকে মানেন নাই। এখন তাঁহার কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া কুলিয়ায় আসিলেন। মহাপ্রভু দেবানন্দের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন এবং মধুর স্বরে বলিলেন, "দেবানন্দ তোমার সমুদায় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বর দিন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই কুলিয়ায় আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাহারই অপরাধ ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন "তথাস্তু!" এইরূপে কুলিয়ায় অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইল এবং অসংখ্য নরনারী অপরাধ ভঞ্জনের জন্য এই 'কুলেরপাটে' সমাগত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, 'কুলেরপাট' বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীতও অনেকে এই পাটে আগমন করিয়া থাকেন। পাটের যে আয় আছে এবং যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে প্রণামী ও দর্শনী পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা এই পাটের সমস্ত ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।



১২। কুলেরপাটের মন্দির—কুলেরপাট



দ্বাদশ বকুল—কুলেরপাট। ইহা কুলেরপাটের একটি দ্রষ্টব্য স্থান



গৌর নিতাই ঠাকুর—কুলেরপাট। গ্রামের জাগ্রত দেবতা



কেশব সেনের বাড়ী

সংক্ষিপ্ত চিত্র-পরিচয়

১। কালী মন্দির—দক্ষিণেশ্বর। স্বনামধন্যা রাণী রাসমণির দ্বারা উৎসর্গীকৃত পুণ্য কীর্ত্তি। ইহা ...ইত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

২। বটবৃক্ষ—পাণিহাটী। রাসযাত্রার সময় এবং বৈষ্ণবী মেলা নামে এখানে বৎসরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে। এই সময় এখানে বহু লোক সমাগম হয় এবং সকলেই ভক্তিভরে এই বটবৃক্ষ ও মাধবীলতা দর্শন করিয়া থাকেন।

৩। রাঘবপণ্ডিতের মাধবীলতা ও সমাধি—পাণিহাটী। কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবরের দ্বারা এই মাধবীলতা রোপিত হইয়াছিল। এইখানেই তাঁহার সমাধি আছে।

৪। নেড়ানেড়ির মেলাস্থান—খড়দহ। নিত্যানন্দ প্রভুর এই স্থানে আগমন ও বাস হইতে ইহার প্রসিদ্ধি। তাঁহার বাসকুটীরসংস্পৃষ্ট খড়দহ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প প্রচলিত আছে। এখানে দোল ও রাসযাত্রার সময় বড় মেলা বসিয়া থাকে।

৫। কালীমন্দির—মূলাযোড়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরদের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পার্শ্বেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

৬। বঙ্কিমবাবুর লিখিবার ঘর—কাঁঠালপাড়া। এই কক্ষে বসিয়াই বঙ্কিমবাবু তাঁহার অমর লেখনী চালনা করিতেন।

৭। হিমসাগর—ঘোষপাড়া। ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত দোল মেলা উপলক্ষে যখন এখানে অনেক জনসমাগম হয়, তখন এই জলাশয়ে বহু লোক স্নান করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস ইহার জলস্পর্শে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৮। ডালিম গাছ—ঘোষপাড়া। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পালেদের উদ্যানে এই গাছটি আছে। এই উদ্যানেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী রামশরণ পালের সমাধি আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই দাড়িম্বতলের মৃত্তিকাস্পর্শে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

৯। আজু গোঁসায়ের ভিটা—হালিসহর। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভক্ত বৈষ্ণব আজু গোঁসায়ের জন্মস্থান।

১০। চৈতন্য ডোবা—হালিসহর। চৈতন্যদেবের পুণ্য স্মৃতির সহিত ইহা

বিজড়িত। বৎসরান্তে এখানে যে মেলা হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে বহু লোকে ইহা দর্শন করিয়া যান।

১১। রামপ্রসাদের পঞ্চবটি—হালিসহর। কিছু কম দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ এই স্থানে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।

১২। কুলেরপাটের মন্দির—কুলেরপাট। এখানে বৎসরান্তে অগ্রহায়ণ মাসের একাদশী তিথিতে দীর্ঘকাল হইতে শ্রীপাট অপরাধভঞ্জনের মহোৎসব ও একটি মেলা বসিয়া থাকে।

গৌরীসেন ও নবাব খাঁ জেহান খাঁ

অন্ধভাবে পরের অর্থ ব্যয় বা দাতার অসাধারণ দান-প্রসঙ্গে গৌরী সেনের নাম এবং আড়ম্বর ও নবাবির কথা-প্রসঙ্গে নবাব খান্‌জা খাঁর কথা পশ্চিম বঙ্গের যত্র তত্র বহুদিন হইতে প্রবচনের মত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বাস কোথায় ছিল এবং কিরূপে খ্যাত্যাপন্ন হইলেন, সে পরিচয় সম্বন্ধে বহু লোকেই অজ্ঞ। তাঁহাদের কথা যাহা জানা যায়, তাহা এইখানে লিখিত হইল।

গৌরীসেন

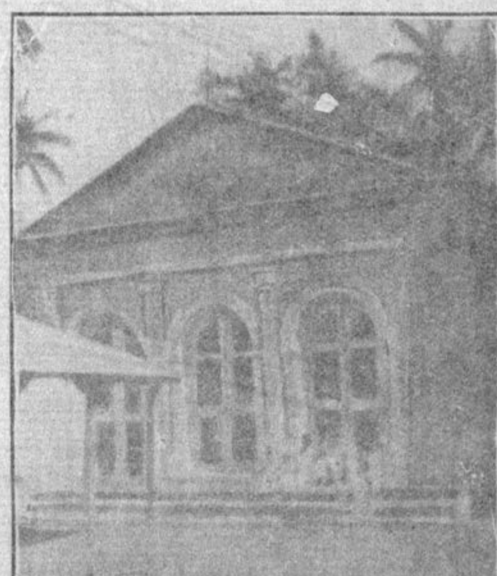
তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সময়ে গৌরী সেন হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে সেন-পরিবারের বংশধর রূপে বসবাস করিতেন। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না বা তাঁহার ঠিক নাম গৌরীপ্রসাদ, গৌরীচরণ অথবা গৌরীশঙ্কর ছিল তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন এবং পিতার নাম ছিল হরেকৃষ্ণ মুরারিধর। "Hooghly Past and Present" গ্রন্থে লেখক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়ন-কালে বলিয়াছেন, সেন-বংশের ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় গৌরীসেন হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ ছিলেন।

গৌরী সেন অসাধারণ সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভের উপলক্ষ তিনি নিজেই হইয়াছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি বলিতে, উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু তিনি পান নাই। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা দ্বারা নিজ চেষ্টায় প্রভূত ধনসঞ্চয়ে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতি সৌভাগ্য দেবীর আকস্মিক কৃপা সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ। মেদ্দিনী শঙ্করপুরে (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামে তাঁহার এক কায়স্থ বন্ধু বাস করিতেন। গৌরীসেন বিক্রয়ার্থ তাঁহার নিকট পণ্য প্রেরণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার কাজ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কথিত আছে সেই সময় তিনি একবার সাত নৌকা দস্তা মেদিনীপুরে চালান করেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ তাহা সমস্ত দৈবক্রমে বিশুদ্ধ রজতে পরিণত হয়। সেই সপ্ততরীর মধ্যে একখানিতে একজন অজ্ঞাতনামা সাধু ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই নৌকাগুলি মেদিনীপুরে পৌছিলে, তাঁহার বন্ধু দস্তার পরিবর্ত্তে উহা রৌপ্যপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। কিন্তু লোভশূন্য মনে সেই সাধু-সুহৃদ মহাশয় নৌকাগুলি সেইরূপ পণ্যপূর্ণ অবস্থায় হুগলীতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

যেদিন নৌকাগুলি হুগলীতে ফিরিয়া আসে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে গৌরীসেন স্বপ্নে দেখেন, যেন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সৌভাগ্য লাভের কথা বলিতেছেন এবং তাঁহার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রত্যাদেশ করিতেছেন। সেন মহাশয় প্রাতঃকালে উঠিয়া ভাগীরথীতীরে গমনপূর্ব্বক এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দর্শনে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। তিনি অচিরে সেই দেবাদিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিবস্থাপন করেন।

গৌরী সেন অকস্মাৎ এই প্রকার অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারী হইয়া সংকল্প করিলেন, তাঁহার এই দৈবলব্ধ ধনরাশির তিনি সদ্ব্যবহার করিবেন। তিনি অকাতরে দুই হস্তে দীনদুঃখীদের সেই ধন দান করিতে লাগিলেন।



গৌরী সেন প্রতিষ্ঠিত মন্দির

যেখানেই কোন লোককে তিনি অর্থের জন্য বিপদগ্রস্ত দেখিতেন বা সাধারণের কোন হিতকর কার্য্য অর্থাভাবে সম্পন্ন হইতেছেনা দেখিতেন, সেখানেই তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। এইরূপে দেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহার দানশীলতার কথা শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন লোকের কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া অর্থাভাব ঘটিলে, এমনই একটা ভরসা দাঁড়াইয়াছিল যে, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে গৌরী সেনের নিকট পাওয়া যাইবে। ইহা হইতেই

—"লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন" কথার সৃষ্টি হয়। সময় সময় লোকে তাঁহার দানশীলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার অর্থের অপব্যয়ও করিত।

কেবল দান খয়রাৎ ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সদ্ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। ক্রিয়াকলাপ এবং সুনাম ও যশাকাঙ্ক্ষায়ও তিনি যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। একসময় তিনি হুগলী ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে এমন এক বিরাট ভোজ ও উপহার দিয়াছিলেন যে, গঙ্গার এপারে তেমন আর কেহ করিতে পারেন নাই।

সেন মহাশয় স্বভাবতঃ ধীর ও বিনয়ী ছিলেন; নিরহঙ্কারিতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহারও অযথা গর্ব্বের তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এক সময় বৈদ্য-বংশসম্ভূত বলরাম সেন নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হাওদা হইতে অবতরণ না করিয়া উপর হইতেই নিমন্ত্রণ করেন। ইহাতে সেন মহাশয় বলেন, যদি তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিমন্ত্রণ না করেন তাহা হইলে সে নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন না।

গৌরী সেনের বংশধর যাঁহারা এখন বর্ত্তমান আছেন সুবর্ণবণিক সমাজে তাঁহাদের এখনও বিশেষ সম্ভ্রম থাকিলেও, পূর্ব্বের সে অর্থবল অনেকদিন লোপ পাইয়াছে। সেই মহাত্মার কীর্ত্তি সকলের এখন আর কিছুই নাই। আছে কেবল তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, তাঁহার পুরাতন মন্দির এবং যশোভূষিত তাঁহার পুণ্যময় নাম।

নবাব খাঁজেহান খাঁ

নবাব খাঁজেহান খাঁ, যিনি নবাব 'খান্জা খাঁ' নামে আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত তিনিও হুগলীবাসী ছিলেন। পারস্য দেশের রাজধানী

টিহার্ণ নগরে তাঁহার বাসস্থান, পিতার নাম সুজা কুলিখাঁ। (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মধ্যে কোন সময়ে তিনি এদেশে আসেন এবং মোগল সম্রাটের কার্য্যে প্রবেশ করেন,—তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ঠিক কোন্ সময় আসেন তাহা প্রকাশ নাই। তাঁহার পারদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং সম্রাট কর্ত্তৃক অচিরে তাঁহার উপর একটি জেলার ভার ন্যস্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে সময় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন, প্রায় সেই সময়ে তিনি হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া ওমার বেগ্ খাঁর স্থানে আসেন।

তাঁহার সুশাসন প্রভাবে তিনি অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেও, মহারাজ নন্দকুমার রায়ের উত্থানের সহিত তাঁহার স্বার্থসংযোগের জন্য তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। আবার যখন নন্দকুমার ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিতে বাধ্য হন, তৎপরে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যতদিন না লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্ত্তৃক ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়, ততদিন একক্রমে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ফৌজদারী উঠিয়া যাওয়ার পর, তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

নবাব যখন ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, তখন তিনি রাজোচিত জাঁকজমকে বাস করিতেন। সমস্ত সহরের মধ্যে তাঁহার বাসভবনের মত সুন্দর ও সুদৃশ্য অট্টালিকা আর কাহারও ছিল না। তাঁহার হস্তিশালা হস্তী ও অশ্বশালা অশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টাভোরিনাস্ (Stavorinus) যখন হুগলীতে আগমন করেন, তিনি এইস্থান দর্শনে

(১) মতিঝিলে যেখানে নবাব খাঁজেহান খাঁর সমাধি আছে, তথাকার রক্ষক এক মুসলমানের নিকট হইতে নবাবের পিতার নাম শুনা যায়,—রজব আলি খাঁ। ইহা ঠিক কি না জানি না।

বলিয়াছেন, এখানে ফৌজদারের প্রাসাদ ও হাতিশালা ভিন্ন দেখিবার মত আর কিছু নাই। নবাব হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন তখন একটি অতি সুন্দর মূল্যবান হাওদা ব্যবহার করিতেন। তিনি অতি মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত থাকিতেন এবং মূল্যবান আহারীয় ভোজন করিতেন। তিনি দেখিতেও যেমন রাজপুত্রের মত ছিলেন, সেইরূপ সর্ব্ব রকমে একজন রাজপুত্রের মতই বাস করিতেন।

নবাবের বেতন প্রচুর ছিল, কিন্তু ইহাই তাঁহার আয়ের একমাত্র উৎস ছিল না। তাঁহার নিজস্ব ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল এবং তাঁহার আয়ও যথেষ্ট হইত। বর্ত্তমান চন্দননগরের অন্তর্বর্ত্তী যে স্থানের নাম গোন্দলপাড়া, যেথায় দিনেমাররা শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে প্রথম ব্যবসা স্থাপন করেন,—উহা নবাবের তালুক ছিল। দিনেমাররা চিরদিনের তরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার পর নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক হারে টাকা দিবার সর্ত্তে উহা ফরাসী কোম্পানিকে পত্তনি দেয়। গোন্দলপাড়ার কতকটা অংশকে এখনও দিনেমারডাঙ্গা বলিয়া থাকে। সালবিলাড়া ও মাহামদামিনপুর নামে তাঁহার আর দুইটি অতি মূল্যবান তালুক ছিল। ইহা শেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হয়। এতদ্ভিন্ন চন্দননগরের পশ্চিমদিকে বিলকুলি নামক স্থানটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সম্পত্তিভুক্ত করিয়াছিলেন। এই জায়গীর পরে সরকার কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হয় এবং উহা এক্ষণে হুগলী জেলার পঞ্চবিংশতি সংখ্যক খাসমহলের অন্যতম।

নবাবের সম্পদের সময় তাঁহার অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণী থাকিত। তাহাদিগকে সাধারণতঃ বেগম বলা হইত। তাঁহার অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন, সুতরাং তখন একটি মাত্র রমণী লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। এই রমণীই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী।

বহুল ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী থাকায় বাস্তবিকই নবাব তাঁহার সময়ে হুগলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সম্ভ্রান্ত ও ভোগবিলাসী ছিলেন। তাঁহার অর্থকৃচ্ছ ঘটাতেও তিনি বিলাসিতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য ক্রমে দেনাগ্রস্ত হইতে থাকেন। তাঁহার এই বিলাসিতা হইতেই নবাবী দৃষ্টান্ত-কথায় খাঁজেহান খাঁর নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।



নবাব খাঁজেহান খাঁর উদ্যান মধ্যস্থ আটপলা বৈঠকখানার ধ্বংসাবশেষ

মানুষের দিন কখন সমান যায় না। ফৌজদারী পদের লোপ প্রাপ্তির সহিত তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইল। তিনি এই সময় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাত্র মাসিক আড়াই শত টাকা বৃত্তি পাইতেন। তিনি পূর্ব্বাপর বিলাসিতা ও আচ্যতার মধ্যে থাকায় তাঁহার

পক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করা অতীব কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং অনতিবিলম্বেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমে দেউলিয়া হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থাতেও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট, হুগলীর শেষ ফৌজদার বলিয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার মধ্যে ধরমপুর নামক পল্লীতে, সাহেবদের পুরাতন গোরস্থানের নিকট তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানভবন থাকিলেও তিনি বরাবর তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হুগলীতে মোগল দুর্গের মধ্যে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে হুগলীর কলেক্টরের ভবন, রোডশেস্ অফিস, ব্রাঞ্চ স্কুল ও পুরাতন কাছারি বাটি যে স্থানে আছে, সেই দুর্গ তথায় অবস্থিত ছিল। এখন আর তাহার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু নবাবের উক্ত বাগানের যে সুবৃহৎ অষ্টকোণ-বিশিষ্ট বৈঠকখানা হইতে আটপলা বাগানের নাম খ্যাত হইয়াছিল, সেই অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সমেত সেই বাগান এখনও আছে। উহা এখন ক্ষেত্রনাথ শীল মহাশয়ের বংশধরদিগের সম্পত্তি এবং এখনও লোকে উহাকে "নবাব বাগান" বলিয়া থাকে। প্রত্যেক বড় বড় দরবার ও সরকারী উৎসবাদি উপলক্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ দ্বারা সম্মানিত করিতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ভবনের যখন উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হয়, তখন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নবাব সেই হীন অবস্থাতেও এই উৎসবে বহু রাজা মহারাজা নবাব প্রভৃতির সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

নবাবের শেষ জীবন অতি কষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন হইয়া দেউলিয়া অবস্থায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার নশ্বর দেহ তাঁহার ভ্রাতার মতিঝিল নামক উদ্যানে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি একটি সামান্য সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। নবাবের